হাদীস শরীফ (اَلْحَدِيْثُ)

পরিচয়

হাদীস মানে কথা বা বাণী। ইসলামের পরিভাষায় মহানবী (স) এর বাণী, কর্ম ও অনুমোদনকে হাদীস বলা হয়।

গুরুত্ব

পবিত্র কুরআনের পরেই হাদীসের স্থান। এটি কুরআন মাজীদের ব্যাখ্যা। কুরআন মাজীদে অনেক কিছু সংক্ষেপে বলা হয়েছে। হাদীসে তাঁর বিস্তারিত বিবরণ আছে। রাসূলুল্লাহ্ (স) এর জীবন আদর্শ আমরা হাদীসে পাই। এ কারণে আমাদের জীবনে হাদীসের গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ্ তাআলা বলেন – "আর রাসূল তোমাদের যা দেন, তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।" (হাশর ৫৯ : ৭)

সিহাহ্ সিত্তাহ্ (اَلصِّحَاحُ السِّتَّةُ)

প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ ছয়টি। এগুলোকে এক সাথে সিহাহ্ সিত্তাহ্ বলে। 'সিহাহ্' অর্থ বিশুদ্ধ এবং সিত্তাহ্ অর্থ ছয়। এ ছয়টি গ্রন্থে মহানবী (স) এর সহীহ্ হাদীসসমূহ একত্রিত করা হয়েছে বলে এগুলোকে সিহাহ্ সিত্তাহ্ বলে। নিম্নে এগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল–

১. সহীহ্ বুখারী : হাদীস গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সহীহ্ বুখারী। কুরআন মাজীদের পর এটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ। এর সংকলকের নাম আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী (র)। তিনি ছয় লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই করে এটি সংকলন করেন। এটি ৩০ পারায় বিভক্ত।

২. সহীহ্ মুসলিম : এর সংকলকের নাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ (র)। তিনি তিন লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই করে এটি সংকলন করেন। বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে সহীহ্ বুখারীর পরে এর স্থান।

৩. সুনানে নাসাঈ : এর সংকলকের নাম আহমাদ ইব্ন শুআইব নাসাঈ। বুখারী ও মুসলিম শরীফের পরই নাসাঈ শরীফের স্থান।

৪. সুনানে আবূ দাউদ : এর সংকলকের নাম আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্ন আশ্‌আছ। তিনি পাঁচ লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই করে এটি সংকলন করেন। এর বিন্যাস পদ্ধতি উন্নতমানের।

৫. জামি' তিরমিযী : এর সংকলকের নাম আবূ ঈসা মুহাম্মাদ ইব্ন ঈসা তিরমিযী। তিনি তাঁর এ কিতাব সম্পর্কে বলেন, "যার ঘরে এ কিতাবখানা থাকবে, মনে করা যাবে যে, তার ঘরে নবী কারীম (স) আছেন এবং তিনি নিজে কথা বলছেন।"

৬. সুনানে ইবন্ মাজাহ্ : এর সংকলকের নাম আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মাজাহ্। হাদীস গ্রন্থসমূহের মধ্যে এর বিশেষ মর্যাদা রয়েছে।

মুনাজাতমূলক হাদীস

আমরা আল্লাহ পাকের কাছে কী চাইব, কিভাবে চাইব মহানবী (স) আমাদের তা শিখিয়ে দিয়েছেন। তাঁর শেখানো নিম্নের তিনটি হাদীস আমরা মুখস্থ করব, অর্থ জানব এবং মুনাজাতে ব্যবহার করব।

(১) اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ وَسَدِّدْنِىْ –

অর্থ : "হে আল্লাহ! আপনি আমাকে সৎপথ দেখান এবং আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন।" (মুসলিম)

আল্লাহ তাআলার দেখানো পথই সরল সহজ ও সঠিক। আমরা তাঁর দেখানো পথ অনুসরণ করব ও সে পথে চলব।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى ـ (২)

অর্থ : "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে চাই পথের দিশা, চাই সৎকাজ করার এবং অসৎকর্ম পরিহার করার শক্তি। চাই পবিত্রতা যাতে পরের অর্থ সম্পদের লোভ লালসা থেকে বাঁচতে পারি। আরও চাই অভাব অনটন থেকে মুক্তি।" (মুসলিম ও তিরমিযী)।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ وَارْحَمْنِىْ وَعَافِنِىْ وَارْزُقْنِىْ ـ (৩)

অর্থ : "হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমার প্রতি দয়া করুন। আমাকে নিরাপদে রাখুন। আমাকে রিযিক দান করুন।" (মুসলিম)

নীতিমূলক হাদীস

আমাদের চরিত্র ও নৈতিক মান উন্নত করার জন্য মহানবী (স) আমাদের অনেক উপদেশ দান করেছেন। তাঁর উপদেশ মেনে চললে আমরা দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ লাভ করতে পারব। আমরা নিম্নের নীতিমূলক হাদীস তিনটি মুখস্থ করব এবং অর্থ শিখব-

لَآاِيْمَانَ لِمَنْ لَّآاَمَانَةَ لَهٗ ـ (১)

অর্থ : "যার মধ্যে আমানতদারী নেই তার ঈমান নেই (তার ঈমান অপূর্ণ)।" (আহমাদ)

ঈমানদার ব্যক্তি মানুষের সাথে অবিশ্বাসের কাজ করতে ও আমানতের খিয়ানত করতে পারে না। খিয়ানত ঈমান বিরোধী ও সমাজদ্রোহী কাজ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আসবাবপত্র জনগণের সম্পত্তি। এগুলো ছাত্র-শিক্ষকের নিকট আমানত। দেশের সম্পদ জনগণের নিকট আমানত। এ আমানতের খিয়ানত বড় অপরাধ। আমরা আমানত রক্ষা করব।

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ ـ (২)

অর্থ : "রক্তের সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" (বুখারী ও মুসলিম)

পিতা-মাতা, ভাই-বোন, চাচা, ফুফু, মামা, খালা, দাদা-দাদীর সাথে আমাদের রক্তের সম্পর্ক আছে। তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার করা, প্রয়োজনে তাঁদের আর্থিক সাহায্য করা আমাদের কর্তব্য। এতে তাঁরা খুশি হবেন। আল্লাহর কাছেও পুরস্কার পাওয়া যাবে। আমরা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখব।

اَلصَّلٰوةُ عِمَادُ الدِّيْنِ ـ (৩)

অর্থ : "সালাত দ্বীন ইসলামের স্তম্ভ।" (বায়হাকী)

স্তম্ভ ছাড়া যেমন ঘরের কল্পনা করা যায় না, তেমনি সালাত ছাড়া দ্বীন ইসলামের কল্পনা করা যায় না।
সালাত বেহেশতের চাবি। সালাত মুমিন ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্যকারী। সালাতে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করা যায়। আমরা সালাতের গুরুত্ব উপলব্ধি করব। নিষ্ঠার সাথে সালাত আদায় করব।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ হয়েছে–

ক. মুসলমানদের জন্য খ. মক্কাবাসীর জন্য
গ. সমগ্র মানব জাতির জন্য ঘ. আরব জাতির জন্য

২। কুরআন মাজীদ প্রথমে সংরক্ষিত ছিল–

ক. হাফিজগণের অন্তরে খ. হযরত আবূ বক্র (রা) এর কাছে
গ. লাওহে মাহ্ফুযে ঘ. হযরত ওসমান (রা) এর কাছে

৩। সূরা আদিয়াত অবতীর্ণ হয়–

ক. মদীনায় খ. জেদ্দায়
গ. মক্কায় ঘ. তায়িফে

৪। মাদ্দে আসলীকে কতটুকু দীর্ঘ করে পড়তে হয় ?

ক. এক আলিফ খ. দুই আলিফ
গ. তিন আলিফ ঘ. চার আলিফ

৫। হাদীস অর্থ–

ক. উপদেশ খ. বাণী
গ. গ্রন্থ ঘ. পাঠ

৬। সালাত দীন ইসলামের স্তম্ভ বলতে বুঝানো হয়েছে–

ক. সালাতের উপর ইসলাম দণ্ডায়মান খ. সালাত ও ইসলাম সমার্থক
গ. সালাত ইসলামের মৌলিক ইবাদাত ঘ. সালাত নিষ্ঠার সাথে আদায় করতে হয়

৭। হযরত ওসমান (রা) কে জামিউল-কুরআন বলা হয়, কারণ–

ক. তিনি হাদীস সংরক্ষণে অবদান রেখেছেন খ. তিনি কুরআনের তাফসীর রচনা করেছেন
গ. তিনি কুরআন সংরক্ষণে অবদান রেখেছেন ঘ. তিনি আঞ্চলিক ভাষায় কুরআন শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন

নিচের অনুচ্ছেদের আলোকে ৮ ও ৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

“হে আমাদের প্রতিপালক। আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি। যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং দয়া না করেন তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।”

৮। কুরআনের এ আয়াতটিতে–

i. পার্থিব কল্যাণ চাওয়া হয়েছে
ii. স্বীয় অপরাধ স্বীকার করা হয়েছে
iii. পরকালের শাস্তি থেকে মুক্তি চাওয়া হয়েছে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

৯। কুরআনের এ আয়াতটি একজন মু’মিনকে শিক্ষা দেয়–

ক. ক্ষমাপ্রার্থী হতে খ. মর্যাদাবান হতে
গ. দয়াবান হতে ঘ. পরোপকারী হতে

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। আজমল হোসেন কুরআন হাদীস সম্পর্কে ভাল জানেন। তিনি পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান। চাকুরি পাওয়ার পর বিয়ে করে পরিবার নিয়ে শহরে চলে যান। তারপর থেকে পিতা-মাতার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন না। এমনকি বিপদে আপদেও টাকা পাঠাচ্ছেন না। অথচ হাদীসে আছে “রক্তের সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।”

ক. হাদীস কী ?
খ. রক্তের সম্পর্ক ছিন্নকারী বলতে কী বোঝ ?
গ. হাদীস অনুযায়ী আজমলের পিতা-মাতার প্রতি কীরূপ ব্যবহার করা উচিত ? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. “রক্তের সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না”–হাদীসটি বুঝিয়ে লেখ।

২। সূরা কারিআহ্‌তে আল্লাহ তাআলা বলেন, "মহাপ্রলয়, মহাপ্রলয় কী ? মহাপ্রলয় সম্পর্কে আপনি কী জানেন ? যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত এবং পর্বতসমূহ হবে ধুনিত রঙীন পশমের মত, তখন যার পাল্লা ভারী হবে, সেতো লাভ করবে সন্তোষজনক জীবন। কিন্তু যার পাল্লা হালকা হবে, তার স্থান হবে হাবিয়া।"

ক. হাবিয়ার অর্থ কী ?

খ. উল্লিখিত সূরাকে কারিআহ্‌ নাম দেওয়া হলো কেন ? ব্যাখ্যা কর।

গ. কিয়ামত দিবসের ভয়াবহ পরিস্থিতির বর্ণনা থেকে তুমি কী শিক্ষা লাভ করতে পার ?

ঘ. কিয়ামতের দিবসে মানুষের ভালমন্দ আমল ওজন করা হবে, বিষয়টি বুঝিয়ে লিখ।

৩। আমরা জানি কুরআন শরীফ রমযান মাসের লাইলাতুল কদরে নাযিল হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, "এই কিতাব আমি নাযিল করেছি যা কল্যাণময়। অতএব তোমরা তার অনুসরণ কর এবং সাবধান হও, হয়ত তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হবে।" আল্লাহ আরো বলেন, "কুরআন আবৃত্তি কর ধীরে ধীরে, স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে।"

ক. লাইলাতুল কদর এর অর্থ কী ?

খ. দয়া প্রদর্শন করা হবে বলতে কী বুঝানো হয়েছে ?

গ. কুরআনের আয়াত অনুযায়ী আমরা কীভাবে কল্যাণ পেতে পারি ?

ঘ. কুরআন শুদ্ধভাবে আবৃত্তি করতে না পারলে নামায সঠিকভাবে আদায় হয় না– বিষয়টি ব্যাখ্যা কর।

চতুর্থ অধ্যায়

আখ্‌লাক (اَلْاَخْلَاقُ)

পরিচয়

আখ্‌লাক (اَخْلَاقٌ) খুলুকুন (خُلُقٌ) শব্দের বহুবচন। এর অর্থ চরিত্র বা স্বভাব। মানুষের কাজ-কর্মের মাধ্যমে তার আচার-ব্যবহার, চাল-চলন এবং স্বভাবের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাকেই আখ্‌লাক বলে। মানুষের চরিত্রের সব দিকই আখ্‌লাকের অন্তর্ভুক্ত। এমনকি আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট জীব-জন্তুর সাথে মানুষের আচার-ব্যবহারও আখ্‌লাকের অন্তর্ভুক্ত।

আখ্‌লাকের প্রকারভেদ

আখ্‌লাক দুই প্রকার

১. আখ্‌লাকে হামীদা (اَخْلَاقٌ حَمِيْدَةٌ) : উত্তম চরিত্রকে আখ্‌লাকে হামীদা বা প্রশংসনীয় আখ্‌লাক বলা হয়। যেমন- ক্ষমা, আমানতদারী, সততা, সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা, পরোপকারিতা, শালীনতা, সৎকাজে সহযোগিতা ইত্যাদি।

২. আখ্‌লাকে যামীমা (اَخْلَاقٌ ذَمِيْمَةٌ) : নিকৃষ্ট চরিত্রকে আখ্‌লাকে যামীমা বা নিন্দনীয় চরিত্র বলে। যেমন- মিথ্যা বলা, গালি দেওয়া, চুরি করা ইত্যাদি।

আখ্‌লাকে হামীদা (اَخْلَاقٌ حَمِيْدَةٌ)

আখ্‌লাকে হামীদার গুরুত্ব

মানব জীবনে আখ্‌লাকে হামীদার গুরুত্ব অপরিসীম। পৃথিবীতে মানুষের যাবতীয় সুখ-শান্তি আখ্‌লাকে হামীদা বা প্রশংসনীয় চরিত্রের ওপর নির্ভরশীল। আখিরাতের সুখ-দুঃখও আখ্‌লাকে হামীদার ওপর নির্ভর করে।

আখ্‌লাকে হামীদার সুফল

১. আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি লাভ

উত্তম চরিত্রের অধিকারী হলে আল্লাহপাক ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন–"তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই আমার নিকট অধিক প্রিয় যার চরিত্র সর্বোত্তম।" (বুখারী ও মুসলীম)

২. ঈমানের পূর্ণতা অর্জন

উত্তম চরিত্র মানুষের ঈমানকে পূর্ণতা দান করে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন–

اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا —

অর্থ : "পূর্ণ মুমিন তাঁরাই যাদের চরিত্র মহান ও সুন্দরতম।" (আবূ দাউদ)

৩. সর্বোত্তম মর্যাদা লাভ

উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট এবং সমাজে উঁচু মর্যাদা লাভ করে থাকেন।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন–"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ যার চরিত্র উত্তম।" (বুখারী)

৪. জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ লাভ

উত্তম চরিত্রের গুণেই আল্লাহ তাআলা চরিত্রবান ব্যক্তিকে জাহান্নামের আগুন থেকে রেহাই দেবেন। মহানবী (স) বলেন, "আল্লাহ তাআলা যার গঠন ও স্বভাব সুন্দর করেছেন দোযখের আগুন তাকে ভক্ষণ করবে না।" (তাবারানী ও বায়হাকী)

এ পাঠে আমরা জানলাম

১. আখলাকের অর্থ ও প্রকারভেদ।

২. উত্তম চরিত্রের গুরুত্ব ও সুফল।

আমরা উত্তম চরিত্রের অধিকারী হব। আদর্শ ও সুন্দর সমাজ গড়ে তোলব। আমাদের জীবন সার্থক হবে।

ক্ষমা (اَلْعَفْوُ)

পরিচয়

ক্ষমা (عَفْوٌ) অর্থ মাফ করা, প্রতিশোধ না নেওয়া। ইসলামের পরিভাষায় প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তিগতভাবে অপরাধীকে মাফ করে দেওয়ার নামই ক্ষমা।

তাৎপর্য

ক্ষমা আল্লাহ তা'আলার একটি বিশেষ গুণ। আল্লাহ তাআলা মানুষকে অনেক নিআমত দান করেছেন। মানুষের সকল সুখ-শান্তির ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু মানুষ মূর্খতাবশত আল্লাহর কথা ভুলে যায়। তাঁর হুকুম অমান্য করে। তাঁর সাথে শির্ক করে। এরপর যখন তারা নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় তখন তিনি তাদের ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ পাক বলেন –"তিনিই তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং পাপ মোচন করেন।" (শূরা ৪২ : ২৫)।

আমাদের প্রিয় নবী (স) ছিলেন ক্ষমার মূর্ত প্রতীক। আল্লাহ তাআলা তাঁকে ক্ষমা করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, "হে নবী! আপনি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন করুন।" (আরাফ ৭ : ১৯৯)।

তিনি আল্লাহর এ নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করেছিলেন। খাইবার বিজয়ের পর এক ইয়াহূদী মহিলা মহানবী (স) কে দাওয়াত দেয় এবং তাঁকে বিষ মিশ্রিত ছাগলের গোশত খেতে দেয়। তিনি কিছু খেতেই বিষক্রিয়া অনুভব করেন। ঐ মহিলাটি গোশতে বিষ দেওয়ার কথা স্বীকার করে। এরপরও দয়ালু নবী তাকে ক্ষমা করে দেন। মক্কা বিজয়ের পর মহানবী (স) তাঁর চিরশত্রুদের ক্ষমা করে দেন। তিনি তাদের বলেন, "আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। তোমরা মুক্ত, স্বাধীন।" পৃথিবীর ইতিহাসে ক্ষমার এমন দৃষ্টান্ত বিরল। ক্ষমার গুরুত্ব অনেক। অপরাধীকে ক্ষমা করা হলে অপরাধী অনুতপ্ত হয়, লজ্জিত হয়। ক্ষমাকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়।

আল্লাহ তাআলাও ক্ষমাকারীর মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ তাআলা বলেন–"যে ব্যক্তি ক্ষমা করে দেয় ও আপোষ এবং শান্তির পথ অবলম্বন করে, তার পুরস্কার রয়েছে আল্লাহর নিকট।" (শূরা ৪২ : ৪০)

এ পাঠে আমরা জানলাম

১. ক্ষমার অর্থ ও সুফল।

২. মহানবী (স) এর ক্ষমার দৃষ্টান্ত।

আমরা ক্ষমার গুণে গুণান্বিত হব। অপরাধীকে ক্ষমা করব।

পরোপকার (اَلْاِحْسَانُ)

পরিচয়

পরোপকার (اِحْسَانٌ) অর্থ অন্যের উপকার করা। পরিভাষায়, আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি মানুষের যে সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে, সেগুলো উত্তমরূপে পালন করার নাম পরোপকার।

তাৎপর্য

পরোপকার আল্লাহ তাআলার একটি বড় গুণ। সকল সৃষ্টির প্রতি রয়েছে তাঁর অসীম দয়া ও করুণা। তিনি বিশ্বাসী অবিশ্বাসী সকলের প্রতিই দয়া করেন। তিনি সকল মানুষকে সমান যোগ্যতা ও দক্ষতা দিয়ে সৃষ্টি করেননি। এ কারণে মানুষ পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। তাই মানুষকে সাধ্য ও সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যের উপকার করতে হবে।

পরোপকারের সুফল

১. আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ

যে ব্যক্তি অন্যের উপকার করে আল্লাহ্ তাআলা তাকে ভালবাসেন। তিনি বলেন–

وَاَحْسِنُوْا ج اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ○

অর্থ : "তোমরা সৎকর্ম ও পরোপকার কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মশীল ও পরোপকারীদের ভালবাসেন।" (বাকারা ২ : ১৯৫)

২. শান্তি প্রতিষ্ঠা

পরোপকার দ্বারা সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। ধন-সম্পদ ব্যয় করে এবং ভাল কথা বলেও অপরের উপকার করা যায়। এতে সমাজে ঝগড়া-ফাসাদ দূর হয়। শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩. বন্ধুত্ব অর্জন

পরোপকার দ্বারা কঠোর হৃদয়বিশিষ্ট লোকের অন্তরকেও জয় করা যায়। পরম শত্রুকে আপন করা যায়।

৪. আল্লাহর রহমত লাভ

আল্লাহর কোন সৃষ্টির প্রতি দয়া করলে তিনি দয়াকারী ব্যক্তির ওপর রহমত বর্ষণ করেন। মহানবী (স) বলেন, "যারা পৃথিবীতে আছে, তাঁদের প্রতি তোমরা দয়া কর। তাহলে যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।" (আবূ দাউদ ও তিরমিযী)

আমরা আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টির উপকার করব। আমরা বিপদে-আপদে, দুর্দিনে অপরের সাহায্য করব। তাদের খোঁজ-খবর নেব। এতে আল্লাহ্ তাআলা আমাদের প্রতি খুশি হবেন। আমরা তাঁর রহমত পাব।

শালীনতা (اَلتَّهْذِيْبُ)

পরিচয়

শালীনতা (تَهْذِيْبٌ) অর্থ ভদ্রতা, নম্রতা ও লজ্জাশীলতা। চাল-চলনে, বেশ-ভূষায় ও কথা-বার্তায় মার্জিত পন্থা অবলম্বন করাকে শালীনতা বলে।

গুরুত্ব

শালীনতার গুরুত্ব অপরিসীম। এটি মানুষের একটি মহৎ গুণ। শালীনতাবোধ মানুষকে অশ্লীল ও অবৈধ কাজ-কর্ম থেকে বিরত রাখে। আল্লাহ্ তাআলার অনুগত বান্দা হতে সাহায্য করে। নারী-পুরুষ শালীনতার সাথে চরাফেরা করলে এবং শালীন পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করলে অনেক অঘটন থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। অশালীন পোশাক ও চাল-চলন অনেক সময় বিপর্যয় ডেকে আনে, সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করে, নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয় ঘটায়। এতে মানুষ মন্দ চরিত্রের প্রতি প্রলুব্ধ হয়। শালীন ও ভদ্র আচরণের মাধ্যমে বন্ধুত্ব ও হৃদ্যতা গড়ে উঠে। আর অশালীন আচরণ বন্ধুকেও দূরে সরিয়ে দেয়। মানুষ অশালীন ব্যক্তির সংস্পর্শ ত্যাগ করে। অশালীন ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার নিকট নিকৃষ্ট। রাসূলুল্লাহ (স)

বলেন, "আল্লাহ তাআলার নিকট ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে খারাপ যার অশ্লীলতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য লোকেরা তাকে ত্যাগ করে।" (বুখারী)। নবী কারীম (স) আরও বলেন–

اِنَّ اللّٰهَ يَبْغَضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ –

অর্থ : "নিশ্চয়ই আল্লাহ অশালীন ও দুশ্চরিত্র ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন।" (তিরমিযী)

হযরত লুকমান (আ) তাঁর পুত্রকে শালীনতা শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেন,"অহঙ্কার বশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা কর না। পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে চল না, কারণ আল্লাহ কোন উদ্ধত অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না। তুমি পদচারণা কর সংযতভাবে এবং তোমার কণ্ঠস্বর নিচু কর। নিশ্চয়ই স্বরের মধ্যে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।" (লুকমান ৩১ : ১৮–১৯)

এ পাঠে আমরা শিখলাম

১. শালীনতার গুরুত্ব।

২. অশালীনতার কুফল।

আমরা শালীনতার গুরুত্ব বুঝব। আমাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে শালীনতা অবলম্বন করে চলব। এতে জীবন সুন্দর হবে। সমাজে সুন্দর পরিবেশ গড়ে ওঠবে।

সৃষ্টির সেবা (خِدْمَةُ الْخَلْقِ)

পরিচয়

সৃষ্টির সেবা (خِدْمَةُ الْخَلْقِ) অর্থ আল্লাহর সকল সৃষ্টির সেবা করা। আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি এ সব লালনপালন করেন। আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির প্রতি যত্নবান ও মনোযোগী হওয়ার নামই সৃষ্টির সেবা।

তাৎপর্য

পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহ তাআলার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, তাই সকল সৃষ্টির প্রতি তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব অনেক। মানুষ মানুষের ভাই। কাজেই কেউ ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত বা অভাবগ্রস্ত হলে তার প্রতি সদয় হতে হবে। তার অভাব মোচনে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। এতে আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হবেন এবং আখিরাতে এর প্রতিদান দেবেন। নবী কারীম (স) বলেন, "যে মুসলমান অপর মুসলমানকে তার কাপড়ের অভাবের সময় কাপড় দান করে, আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতে সবুজ বর্ণের পোশাক দান করবেন। যে মুসলমান অপর মুসলমানকে ক্ষুধার সময় খাদ্য দেয়, আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতের ফল দান করবেন। যে মুসলমান একজন মুসলমানকে পিপাসার সময় পানি পান করাবে, আল্লাহ তাকে সীলমোহর লাগানো পাত্র থেকে পবিত্র পানীয় পান করাবেন।" (আবূ দাউদ)।

আমাদের সমাজে অনেক ইয়াতীম, গরিব ও মিস্‌কীন আছে। যারা এ সকল গরিব মিস্‌কীনের প্রতি সদয় হয় আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ○

অর্থ : "খাবারের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তারা মিস্‌কীন, ইয়াতীম ও বন্দীকে খাদ্য দান করে।" (দাহ্‌র ৭৬ : ৮)

সমাজের কোন ব্যক্তি পীড়িত হলে তার সেবা-শুশ্রূষা করতে হবে। কেউ ঋণগ্রস্ত হলে তার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা নিতে হবে। এভাবে মুসলমান ভাইয়ের সেবা করলে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সাহায্য পাওয়া যাবে। নবী কারীম (স) বলেন, "যে মুসলমান অন্য মুসলমান ভাইয়ের অভাব পূরণ করে আল্লাহ তার অভাব পূরণ করেন।" (মুসলিম)

শুধু মানুষের সেবা করলেই দায়িত্ব শেষ হয় না। পশু-পাখি, কীট-পতংগ, গাছ-পালা, তরু-লতা সব কিছুর প্রতিই মানুষের দায়িত্ব রয়েছে। কারণ এ সব কিছু মিলেই আমাদের পরিবেশ। আমাদের নিজেদের স্বার্থেই এ পরিবেশ রক্ষা করতে হবে। এছাড়া আল্লাহ পাকের কোন সৃষ্টিই অযথা নয়। সব কিছুই তিনি আমাদের উপকারের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আমাদের প্রিয় নবী (স) পৃথিবীর সকল বস্তুর প্রতি সদয় ছিলেন। তিনি সকল সৃষ্টির সেবার প্রতি আমাদের উৎসাহিত করে বলেন–

"সকল সৃষ্টিই আল্লাহতাআলার পরিজন। সৃষ্টির মধ্যে সে ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় যে তাঁর পরিজনের প্রতি সদয়।" (বায়হাকী)

গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগী, কুকুর-বিড়াল সকল প্রাণীরই আমাদের মত ক্ষুধা পিপাসা আছে। এগুলোকে খেতে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব। মহানবী (স) বলেন, "কোন এক মহিলা একটি বিড়াল বেঁধে রাখে। সে তাকে খেতে দেয় না এবং ছেড়েও দেয় না যাতে পোকা-মাকড় খেয়ে জীবনধারণ করতে পারে। অবশেষে বিড়ালটি বাঁধা অবস্থায় খাদ্য অভাবে মারা যায়। এ অপরাধের কারণে আল্লাহ তাআলা সেই মহিলাটিকে আযাব দেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

মহানবী (স) আরো বলেন, "বনী ইসরাঈলের এক পাপী মহিলা একটি তৃষ্ণার্ত কুকুরকে পিপাসায় কাতর দেখে পানি পান করায়। এতে আল্লাহ তাআলা তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাকে ক্ষমা করে দেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

জীব-জন্তুর সেবার পাশাপাশি বৃক্ষ-লতার প্রতিও সদয় হতে হবে। বিনা কারণে কোন গাছ কাটা যাবে না। গাছের পাতা ছেড়া যাবে না। কারণ গাছ-পালাও আল্লাহ পাকের তাস্‌বীহ পাঠ করে।

আমরা সৃষ্টির সেবা করব। কোন প্রাণীকে কষ্ট দেব না। গাছ লাগাব ও সংরক্ষণ করব। অকারণে কোন গাছ নষ্ট করব না।

আমানত (اَلْاَمَانَةُ)

পরিচয়

আমানত (اَلْاَمَانَةُ) অর্থ গচ্ছিত রাখা। কারও টাকা পয়সা বা মূল্যবান জিনিস গচ্ছিত রাখাকে আমানত বলা হয়। যে গচ্ছিত সম্পদ স্বযত্নে রেখে মালিকের কাছে যথাযথভাবে ফেরত দেয় তাকে আমানতদার বলে। আমানতের মাল আত্মসাৎ করাকে খিয়ানত বলে। আর আত্মসাৎকারীকে খিয়ানতকারী বলে।

প্রয়োজনীয়তা

মানব জীবনে আমানতের প্রয়োজনীয়তা অনেক। প্রত্যেকের নিজ নিজ দায়িত্ব তার নিকট পবিত্র আমানত। সন্তান-সন্ততি পিতা-মাতার নিকট আমানত। তাদের লালন-পালন ও সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা পিতা-মাতার দায়িত্ব। দোকানের কর্মচারীদের হাতে দোকানটি মালিকের আমানত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আসবাবপত্র, লাইব্রেরীর বই-পুস্তক শিক্ষার্থীদের নিকট আমানত। ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাদান ও চরিত্রগঠন শিক্ষকগণের নিকট পবিত্র আমানত। দেশের সম্পদ জনগণের হাতে আমানত।

প্রত্যেক কর্মচারীর নিকট তার বিভাগটি আমানত। দেশের সরকারের নিকট সমগ্র দেশ আমানত। আমানতের রক্ষণাবেক্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা বলেন–

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا (٤)

অর্থ : "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও।" (নিসা ৪ : ৫৮)

আমানতের খিয়ানত জঘন্য অপরাধ। নবী কারীম (স) খিয়ানতকে মুনাফিকের আলামত বলে উল্লেখ করেছেন। আমানত সম্পর্কে আল্লাহর কাছেও জবাবদিহি করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন–

"তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।" (বুখারী)

এ পাঠে আমরা শিখলাম

১. আমানতের অর্থ ও গুরুত্ব।

২. আমানতের প্রয়োজনীয়তা।

আমরা আমানতের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করব। জীবনে সকল ক্ষেত্রে আমানতদার হব। আমানতদারীর সাথে সকল দায়িত্ব পালন করব।

শ্রমের মর্যাদা (شَرَفُ الْعَمَلِ)

আয় উপার্জন, মানুষের কল্যাণ এবং সৃষ্টির সেবামূলক যে কোন কাজকে শ্রম বলে। পরিশ্রম উন্নতি ও সৌভাগ্যের চাবিকাঠি। যে জাতি যত বেশি পরিশ্রমী সে জাতি তত বেশি উন্নত।

শ্রমের মর্যাদা

ইসলামে শ্রমের মর্যাদা অত্যধিক। আল্লাহ পাক বলেন – وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى ۝

অর্থ : "মানুষ তাই পায় যা সে করে" (নাজ্‌ম ৫৩ : ৩৯)। পরিশ্রম করে উপার্জন করা একটি ইবাদাত। মহানবী (স) বলেছেন –

طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ –

অর্থ : "ফরয ইবাদাতের পর হালাল রুজি উপার্জন করা আর একটি ফরয ইবাদাত।" (বায়হাকী)

আল্লাহ তাআলা এ পৃথিবীতে মানুষের কল্যাণের জন্য অগণিত সম্পদ রেখে দিয়েছেন। এ সম্পদ আহরণের জন্যে প্রয়োজন শ্রমের। আল্লাহ্ তাআলার মেহেরবানীতে আমরা জন্মগতভাবেই শ্রমের উপকরণগুলো লাভ করেছি। এগুলো হচ্ছে আমাদের হাত, পা ও মস্তিষ্ক। আর এগুলোই শ্রমশক্তি। এ শক্তি কাজে লাগানোর জন্য আল্লহ তাআলা আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন–

"তিনি তো তোমাদের জন্য ভূমি সুগম করে দিয়েছেন। কাজেই তোমরা এর দিক-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তাঁর দেওয়া রিযিক থেকে আহার কর।" (মূলক ৬৭ : ১৫)। আমাদের প্রিয় নবী (স) শ্রমকে ভালবাসতেন। তিনি নিজে শ্রমে অভ্যস্ত ছিলেন। ছোট বেলায় তিনি পশু চরাণ। বড় হয়ে ব্যবসা করেন। খন্দক যুদ্ধে পরিখা খননে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

নবী দুলালী হযরত ফাতিমা (রা) নিজ হাতে যাঁতা ঘুরাতেন। যে কারণে তাঁর হাতে দাগ পড়ে গিয়েছিল। নিজেই পানির মশ্‌ক বয়ে আনতেন। ফলে বুকে দড়ির দাগ পড়ে গিয়েছিল। নিজে ঝাড়ু দিতেন এতে তার কাপড়-চোপড় ময়লা হয়ে যেত। (আবূ দাউদ)

শ্রমজীবীর মর্যাদা সম্পর্কে মহানবী (স) বলেন– اَلْكَاسِبُ حَبِيْبُ اللّٰهِ

অর্থ : "শ্রমজীবী আল্লাহর বন্ধু।" (বায়হাকী)। মহানবী (স) আরো বলেন– "নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য আর কিছুই নেই। আল্লাহর নবী দাউদ (আ) নিজের হাতে কাজ করে খেতেন।" (বুখারী)

সাহাবীগণ একদিন নবী কারীম (স) কে জিজ্ঞেস করেন : "কোন প্রকার উপার্জন উত্তম ?" নবী কারীম (স) এর জবাবে বলেন, "মানুষের নিজ হাতের কাজের বিনিময় এবং সৎ ব্যবসা থেকে প্রাপ্ত মুনাফা।" (আহমাদ)

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব মহানবী (স) এবং তাঁর সাহাবীগণ জীবিকার জন্য পরিশ্রম করতে বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ করতেন না। তাঁরা আমাদের জন্য শ্রমের মর্যাদার এক উজ্জ্বল আদর্শ রেখে গেছেন। কুরআন মাজীদে আল্লাহ্ তাআলা শ্রমজীবীদের প্রশংসায় বলেন, "এমন বহুলোক আছে যারা জমিনের দিকে দিকে ভ্রমণ করে ও আল্লাহর অনুগ্রহ খুঁজে বেড়ায়।" (মুয্‌যাম্মিল ৭৩ : ২০)

আল্লাহ তাআলা আমাদের নির্দেশ দিয়ে বলেন, "নামায শেষ হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ কর।" (জুমুআ ৬২ : ১০)

ইসলামে শ্রমিকের মজুরি সাথে সাথে আদায় করার নির্দেশ দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "মজুরের মজুরি তার শরীরের ঘাম শুকানোর আগেই আদায় করে দেবে।" (বায়হাকী)

আমরা শ্রমের মর্যাদা দিতে অভ্যস্ত হব। নিজ হাতে কাজ করতে শেখব। আমরা স্বাবলম্বী হব।

সততা (اَلصِّدْقُ)

পরিচয়

সততা (صِدْقٌ) অর্থ সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা, সাধুতা। কাজে-কর্মে, কথা-বার্তায়, লেনদেনে এক কথায় জীবনের সকল ক্ষেত্রে ন্যায়নীতি অবলম্বন করাকে সততা বলে। সত্য কথা বলা, সৎ পথে চলা, সুবিচার করা, অঙ্গীকার পালন করা, আমানত রক্ষা করা, প্রতারণা না করা সততার অন্তর্ভুক্ত।

গুরুত্ব

সততা একটি মহৎ গুণ। মানব জীবনের সুখ-শান্তি, নিরাপত্তা ও সামাজিক শৃঙ্খলা সততার ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। সততার গুণেই নবীগণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। নবুওয়্যাত প্রাপ্তির পূর্বে মহানবী (স) এ গুণেই সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। সততা মানুষকে আল্লাহ ভীরু করে। সৎলোক ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে সচেতন থাকে। সৎব্যবসায়ী দ্রব্যে ভেজাল দেয় না এবং পণ্যের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে না। সৎকর্মচারী কাজে ফাঁকি দেয় না। সৎলোক প্রতারণা করে না, প্রবঞ্চনা করে না।

সততা মানুষকে বিপদমুক্ত করে, সফলতা দান করে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "তোমাদের কর্তব্য হল সত্যবাদিতা রক্ষা করা। কেননা সত্যবাদিতা পরম কল্যাণকর কাজের দিকে পরিচালিত করে। আর এ কল্যাণময় কাজই জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেয়।" (বুখারী ও মুসলিম)।

সততার গুণে গুণান্বিত ব্যক্তি সকলের বিশ্বাস অর্জন করে, শ্রদ্ধা লাভ করে, এমনকি পরম শত্রুও তাকে বিশ্বাস করে।

আমরা সততার গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করব। নিজেদের জীবনে সততা অবলম্বন করব। আমরা সৎভাবে জীবনযাপন করব।

সৎ কাজে সহযোগিতা এবং অসৎ কাজে অসহযোগিতা

পরিচয়

সৎকাজ বলতে সদাচার, সত্য কথা, সেবা ও কল্যাণমূলক সবকিছুকেই বুঝায়। আন্তরিক শুভেচ্ছা, মৌখিক সমর্থন, কায়িক পরিশ্রম এবং আর্থিক সাহায্যের মাধ্যমে সৎ কাজে সহযোগিতা করা যায়। যেমন, দুস্থ ও পঙ্গুদের সাহায্য করা এবং তাদের স্বাবলম্বী করার জন্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। এমনিভাবে নিরক্ষরতা দূরীকরণে স্কুল-মাদরাসা নির্মাণ করা, পুল নির্মাণ করা, জনস্বাস্থ্য রক্ষার্থে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা এবং স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট নির্মাণ করা।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন– وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى (ص)

অর্থ : "আর তোমরা সৎ কাজ এবং তাক্ওয়ায় একে অপরের সাহায্য সহযোগিতা কর।" (মায়িদা ৫ : ২)

সৎ কাজে সহযোগিতা এবং অসৎ কাজে বাধা দেওয়ার জন্যই মুসলমানদের আবির্ভাব। আল্লাহ বলেন, "তোমারাই হলে সর্বোত্তম জাতি, মানুষের কল্যাণের জন্যই তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান করবে ও অসৎ কাজে বাধা দেবে।" (আলে–ইম্‌রান ৩ : ১১০)

সৎ কাজে সহযোগিতা করলে কাজ সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ সাওয়াব পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন–

مَنْ دَلَّ عَلٰى خَيْرٍ فَلَهٗ مِثْلُ اَجْرِ فَاعِلِهٖ ○

অর্থ : "সৎ কাজের পথ প্রদর্শনকারী ঐ কাজ সম্পাদনকারীর মত সাওয়াব পাবে।" (মুসলিম)

অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, "যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদকে জিহাদের সরঞ্জাম সংগ্রহ করে দিল, সে যেন নিজেই জিহাদ করল। আর যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদ পরিবার পরিজনের সাথে তার অনুপস্থিতিতে ভাল ব্যবহার করল, সেও যেন জিহাদ করল।" (বুখারী)

সমাজে যেমন ভাল লোক থাকে, তেমনি কিছু মন্দ লোকও থাকে, তারা অসৎ কাজে লিপ্ত থাকে, সমাজে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এ ধরনের লোক সমাজ ও দেশের দুশমন। এদের কোন কাজে সহযোগিতা করা ঠিক নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন– وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (ص)

অর্থ : "তোমরা পাপ ও সীমা লংঘনের কাজে একে অন্যের সহযোগিতা কর না।" (মায়িদা ৫ : ২)

সমাজে একজন অন্যায় করলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে বাধা দিতে হবে। নচেৎ তার দেখাদেখি অন্যরাও সে অন্যায় কাজটি করে ফেলতে পারে। মহানবী (স) বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ কাউকে কোন অন্যায় কাজ করতে দেখ, তখন তাকে হাত দিয়ে বাধা দেবে। যদি তাতে অপারগ হও, তবে মুখে বাধা দেবে। আর যদি তাও না পার, তবে অন্তরের সাথে ঘৃণা করবে। আর এটাই হল দুর্বলতম ঈমানের পরিচয়।" (মুসলিম)

এ পাঠে আমরা জানলাম

১. সৎ কাজে সহযোগিতার সুফল।

২. অসৎ কাজে সহযোগিতার কুফল।

আমরা সৎ কাজে সহযোগিতা করব। অসৎ কাজে কখনও সহায়তা করব না। যারা অসৎ কাজ করে, তাদের বাধা দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করব।

আখ্‌লাকে যামীমা (اَخْلَاقٌ ذَمِيْمَةٌ)

যেসব অসৎ কাজ মানুষকে হীন, নীচ ও নিন্দনীয় করে তোলে তাকে আখ্‌লাকে যামীমা বা নিন্দনীয় চরিত্র বলে। যেমন, হিংসা, ক্রোধ, লোভ, প্রতারণা, ছিনতাই, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, খিয়ানত করা ইত্যাদি। আখ্‌লাকে যামীমা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে কলুষিত করে তোলে। এ চরিত্রের অধিকারীকে কেউ পছন্দ করে না, শ্রদ্ধা করে না। সে দুনিয়া ও আখিরাতে ঘৃণিত-অভিশপ্ত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "বান্দা তার কুচরিত্রের কারণে জাহান্নামের নিম্নস্তরে পৌঁছে যায়।" (তাবারানী)

হিংসা (اَلْحَسَدُ)

পরিচয়

হিংসা (حَسَدٌ) অর্থ ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা। অপরের ধন-সম্পদ, মান-সম্মান অপছন্দ করে এবং তা বিলুপ্তির কামনা করাকে হিংসা বলে। যেমন, ধনী ব্যক্তির ধন-দৌলত, কারও ভাল ফলাফল বা উচ্চ মর্যাদা দেখে ঈর্ষান্বিত হওয়া এবং তার ধ্বংস কামনা করা।

অপকারিতা

হিংসা একটি মারাত্মক মানসিক রোগ। হিংসার অপকারিতা অনেক। মানব সৃষ্টির পর হিংসার কারণেই সর্বপ্রথম পাপ সংঘটিত হয়। ইবলীস্ হযরত আদম (আ) এর পদমর্যাদা দেখে তাঁর প্রতি হিংসা করে। ফলে সে অভিশপ্ত হয়। আল্লাহ তাআলার রহমত থেকে বঞ্চিত হয়। আদম (আ) এর পুত্র কাবিল তার আপন ভাই হাবিলকে হত্যা করে এ হিংসার বশবর্তী হয়েই।

হিংসা মানুষের নেক আমল ধ্বংস করে দেয়। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন–

اِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ–

অর্থ : "হিংসা পুণ্যকে এমনভাবে ধ্বংস করে দেয় যেমন আগুন লাকড়িকে জ্বালিয়ে ছাই করে দেয়।" (ইব্‌ন মাজাহ্)

হিংসা মনে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে রাখে। হিংসুক নিজেই এ আগুনে জ্বলতে থাকে। হিংসুক ব্যক্তি আল্লাহ এবং মানুষের কাছে ঘৃণিত। তাকে কেউই ভালবাসে না। কেউই তার বন্ধুত্ব কামনা করে না। সবাই তাকে এড়িয়ে চলে।

হিংসা মানুষের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি করে। এতে সমাজে ঝগড়া ফাসাদ এবং মারামারি সৃষ্টি হয়। সমাজে অশান্তি নেমে আসে। হিংসা মানুষের মনে অহঙ্কার সৃষ্টি করে। আর এ অহঙ্কারই পতনের মূল।

হিংসা বর্জনকারী আল্লাহর নিকট অতি প্রিয়। সে সহজে জান্নাত লাভ করবে। একবার রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর একজন সাহাবীকে জান্নাতের অধিকারী বলে উল্লেখ করেন। তিনি কী আমল করেন এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়। তখন তিনি বলেন, "আল্লাহ্ তাআলা যাকে কোন উত্তম বস্তু দান করেছেন আমি তার প্রতি কখনও হিংসা পোষণ করি না।" (ইব্ন মাজাহ্)

আমরা হিংসার কুফল সম্পর্কে সচেতন থাকব। কারও প্রতি হিংসা পোষণ করব না। এতে আমাদের মন প্রফুল্ল থাকবে। সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকবে।

ক্রোধ (اَلْغَضَبُ)

পরিচয়

ক্রোধ (غَضَبٌ) অর্থ রাগ বা গোস্বা। স্বার্থহানি বা কারও দ্বারা তিরস্কৃত হওয়ার কারণে প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছায় মানুষের মধ্যে যে রাগের সৃষ্টি হয় তাকে ক্রোধ বলে। অহঙ্কার, তিরস্কার, ঝগড়া প্রভৃতি কারণে ক্রোধের সৃষ্টি হয়।

অপকারিতা

ক্রোধ অত্যন্ত নিন্দনীয় চরিত্র। ক্রোধ মানুষের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। আর হিংসা মানুষের নেক আমল ধ্বংস করে দেয়। ক্রোধের কারণে অনেক সময় মানুষের হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়। সে নিজেকে সংযত রাখতে পারে না। ক্রোধ যখন সীমা অতিক্রম করে তখন তা মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়। এতে অনেক অঘটন ঘটে যায়। ক্রোধ ঈমানকে ধ্বংস করে দেয়। মহানবী (স) বলেন, "সিরকা মধুকে যেভাবে বিনাশ করে, ক্রোধও ঈমানকে তদ্রূপ নষ্ট করে।" (বায়হাকী)

ক্রোধ সংবরণ করলে আল্লাহর গযব থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। বিশিষ্ট সাহাবী হযরত ইব্ন উমার (রা) রাসূলুল্লাহ (স) এর কাছে জানতে চাইলেন, কোন কাজ তাঁকে আল্লাহর গযব থেকে রক্ষা করবে ? রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, "তুমি রাগ করবে না।" (তাবারানী)

ক্রোধ সংবরণ করা একটি নেক কাজ। জনৈক সাহাবী মহানবী (স) কে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে একটি ভাল কাজের নির্দেশ দিন।" রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, "তুমি রাগ করবে না।" (বুখারী)

ক্রোধ সংবরণ একটি বীরত্বপূর্ণ কাজ। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "কুস্তিযুদ্ধে যে বিপক্ষকে পরাস্ত করে সে প্রকৃত বীর নয়, বরং ক্রোধের সময় যে নিজেকে বশে রাখতে পারে, সেই প্রকৃত বীর। (বুখারী)

আমরা ক্রোধের অপকারিতা উপলব্ধি করব। ক্রোধ বর্জন করে চলব, এতে আমরা সুখে থাকব। সমাজে শান্তি বিরাজ করবে।

লোভ (اَلْحِرْصُ)

পরিচয়

লোভ (حِرْصٌ) অর্থ লালসা, লিপ্সা। অতিরিক্ত পাওয়ার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে লোভ বলে। লোভ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন- অর্থ-সম্পদের লোভ, পদমর্যাদার লোভ, খাদ্যদ্রব্যের লোভ, পোশাক-পরিচ্ছদের লোভ ইত্যাদি।

কুফল

লোভ মনের শান্তি নষ্ট করে। লোভী ব্যক্তি নিজের নিকট যা আছে তাতে তুষ্ট না থেকে আরও পাওয়ার আশায় অস্থির থাকে। লোভের কারণে মানুষ নানা প্রকার অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত হয়। ডাকাতি, রাহাজানি, কালোবাজারি, মজুদদারি,

ছিনতাই, দ্রব্যে ভেজাল দেওয়া, সুদ-ঘুষ খাওয়া ইত্যাদি অপরাধমূলক কাজ লোভের কারণেই সংঘটিত হয়। খাদ্যের লোভে মানুষ মাত্রাতিরিক্ত খায়। এতে সে নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এমনকি তা কখনও জীবন নাশের কারণ হয়। কথায় বলে, "লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।"

লোভ থেকে বাঁচার উপায়

ধৈর্য এবং অল্পে তুষ্টির গুণ থাকলে লোভ-লালসা থেকে বাঁচা যায়। জীবনযাপনের ক্ষেত্রে সহজ সরল পথ অবলম্বন করলে লোভ বর্জন করা সম্ভব হয়। তাকদীরের ওপর বিশ্বাস রাখা লোভ দমনের প্রধান উপায়। নবী কারীম (স) বলেন, "হে মানব মণ্ডলী! তোমরা চাওয়ার ক্ষেত্রে উত্তম পথ অবলম্বন কর। কেননা বান্দার ভাগ্যে যা নির্ধারিত আছে তার অতিরিক্ত সে পাবে না।" (হাকিম)

আমরা লোভের কুফল জানব। লোভ বর্জন করব। তাকদীরের ওপর ঈমান রাখব। যা আছে তাতে সন্তুষ্ট থাকব। আমরা সুখি হব।

প্রতারণা (اَلْغَشُّ)

পরিচয়

প্রতারণা (غَشٌّ) অর্থ প্রবঞ্চনা, ধোঁকা দেওয়া, কাউকে ঠকান। কথা-বার্তা, আচার-আচরণ, লেন-দেন, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে ধোঁকা দেওয়াকে প্রতারণা বলে। অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, পণ্যদ্রব্যের দোষ-ত্রুটি গোপন রেখে বিক্রি করা ইত্যাদি বড় ধরনের প্রতারণা।

কুফল

প্রতারণা একটি সামাজিক অপরাধ। এর ফলে সমাজের মানুষ দুঃখ কষ্ট ভোগ করে। সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট হয়। মানুষের জীবনযাত্রা দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। প্রতারণাকারী খাঁটি মুসলমান নয়। রাসূলুল্লাহ্ (স) একদিন বাজারে গিয়ে খাদ্যদ্রব্যের একটি বড় স্তূপ দেখতে পান। স্তূপটির উপরিভাগের দ্রব্য শুকনো ছিল। ভেতরের অংশও শুকনো আছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য তিনি স্তূপের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দেন। তখন দেখা গেল ভেতরের অংশ ভেজা। মহানবী (স) মালিকের নিকট এর কারণ জানতে চান। মালিক জানাল, তাতে বৃষ্টি পড়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, "তুমি ভেজা খাদ্য উপরে রাখলে না কেন যাতে লোকেরা তা দেখতে পেত ?" নবী কারীম (স) তখন আরো বললেন –

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا –

অর্থ : "যে ব্যক্তি প্রতারণা করে সে আমার উম্মাত নয়।" (তিরমিযি)

প্রতারণা মুনাফিকের কাজ। মুনাফিকের শাস্তি বড়ই কঠোর। সত্যিকার ঈমানদার ব্যক্তি কখনও প্রতারণার আশ্রয় নেয় না। অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না। মানুষকে ধোঁকা দেয় না।

আমরা প্রতারণার কুফল উপলব্ধি করব। কখনও একাজে লিপ্ত হব না। তবে সমাজে শান্তি স্থাপিত হবে।

ছিনতাই (اَلْاِنْتِهَابُ)

পরিচয়

বলপূর্বক অন্যের সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়াকে ছিনতাই বলে। ছিনতাই একটি সমাজবিরোধী অপরাধ।

কুফল

ছিনতাইয়ের কুফল অনেক :

১. ছিনতাই সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট করে।

২. এটা সমাজের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে।

৩. এর ফলে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। মানুষ অর্থ-সম্পদ, মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে চলাচল করতে ভয় পায়।

৪. এর ফলে সমাজে ও রাষ্ট্রে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়।

৫. যে ছিনতাই করে তার পূর্ণ ঈমান থাকে না। মহানবী (স) বলেন, "কোন ব্যক্তি খোলাখুলিভাবে মানুষের সামনে ছিনতাই ও লুটতরাজ করলে সে মুমিন থাকে না।" (আবূ দাউদ)

ছিনতাই বর্বর যুগের চরিত্রবিশেষ। ইসলাম এ বর্বরতাকে সমূলে উৎপাটন করার লক্ষ্যে ঘোষণা করেছে–

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِى الْإِسْلَامِ ۝

অর্থ : "ইসলামী বিধানে না নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার নিয়ম আছে, না অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করার নীতি আছে।" ইসলামে এ ধরনের অপরাধের শাস্তি অতি কঠোর। আল্লাহ্ তাআলা কুরআন মাজীদে ছিনতাই, ডাকাতি, লুটতরাজ ইত্যাদি বিপর্যয় সৃষ্টিকারী অপকর্মের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন।

সুষ্ঠু বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রবর্তিত শাস্তির বিধান সমাজে যথাযথভাবে কার্যকর করা হলে ছিনতাইয়ের মত একটি জঘন্য অপরাধ থেকে মানুষ বিরত থাকবে।

আমরা ছিনতাইয়ের কুফল অনুধাবন করব। এ ধরনের জঘন্য কাজে লিপ্ত হব না। যারা এরূপ কাজ করে তাদের প্রতিহত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া (عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ)

পরিচয়

পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া বলতে বুঝায়, পিতা-মাতার কথামত না চলা, তাঁদের নির্দেশ অমান্য করা। আল্লাহ্র অনুগ্রহের পর সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার অনুগ্রহ সবচেয়ে বেশি। তাঁরা সন্তানের আপনজন। তাঁদের স্নেহ–মমতায় সন্তানরা লালিত-পালিত হয়। সন্তানদের আরাম আয়েশের জন্য তাঁরা সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেন। সন্তানের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য তাঁরা সব রকম ব্যবস্থা করেন। কাজেই সন্তানের কর্তব্য হল পিতা-মাতার বাধ্য থাকা।

পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া জঘন্য অপরাধ। এর অপকারিতা অনেক :

১. শির্কের পর সবচেয়ে বড় গুনাহ্ হল পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া।

২. পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়ার পাপ এত ভয়াবহ যে স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা এ পাপ ক্ষমা করেন না। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, "মহান আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী সকল পাপই ক্ষমা করে দেন। কিন্তু পিতা-মাতার অবাধ্যতার পাপ তিনি ক্ষমা করেন না।" (বায়হাকী)

৩. পিতা-মাতার অবাধ্য হলে পরকালে জাহান্নামের কঠিন আগুনে জ্বলতে হবে। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, "তারাই (পিতা-মাতা) তোমার বেহেশত ও দোযখ।" (ইব্ন মাজাহ্)। অর্থাৎ পিতা-মাতার সন্তুষ্টির ওপর যেমন সন্তানের জান্নাত লাভ নির্ভর করে, ঠিক তেমনি তাঁদের অসন্তুষ্টির কারণে সন্তান দোযখবাসী হবে। নবী কারীম (স) আরও বলেন, "তার সর্বনাশ হোক, তার সর্বনাশ হোক"। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! সে কে ? তখন তিনি বললেন, "যে ব্যক্তি পিতা-মাতা যে কোন একজনকে অথবা উভয়কে বৃদ্ধ অবস্থায় পেল, তবুও সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারল না।" (মুসলিম)

৪. মাতার অবাধ্য হওয়াকে আল্লাহ্ তাআলা হারাম ঘোষণা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন,

إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ —

অর্থ : "আল্লাহ্ তোমাদের জন্য মায়েদের অবাধ্য হওয়াকে হারাম করে দিয়েছেন।" (বুখারী)

৫. পিতা সন্তানের প্রতি অসন্তুষ্ট হলে আল্লাহ তাআলাও তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি।" (তিরমিযী)

পিতা-মাতা সন্তানের কল্যাণেই কখনও তাদের শাসন করেন বা কড়া কথা বলেন। এটা সন্তানকে মেনে নিতে হবে। এতে তার ভবিষ্যৎ সুখময় হবে।

আমরা পিতা-মাতার আদেশ নিষেধ মেনে চলব। এতে তাঁরা সন্তুষ্ট থাকবেন। আল্লাহও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। আল্লাহ তাআলা ক্ষমাকারী–

ক. অপরাধ ক্ষমা করে দেন খ. মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন
গ. কবর আযাব মাফ করে দেন ঘ. হাশরের বিচার সহজ করে দেন

২। খিদমতে খালক অর্থ–

ক. সৃষ্টির সেবা খ. প্রাণীর সেবা
গ. মানুষের সেবা ঘ. পশু-পাখির সেবা

৩। আমানতের খিয়ানত করা–

ক. অপরাধ খ. সামান্য অপরাধ
গ. মাকরূহ ঘ. জঘন্য অপরাধ

৪। হিংসা মানুষের নেক আমলকে–

ক. জ্বালিয়ে দেয় খ. বাধা দেয়
গ. তাড়িয়ে দেয় ঘ. ধ্বংস করে দেয়

৫। ক্রোধের সময় নিজেকে সংযত রাখাকে বলা হয়–

ক. আত্মসংযমী খ. চরিত্রবান
গ. প্রকৃত বীর ঘ. আত্মপ্রত্যয়ী

নিচের অনুচ্ছেদের আলোকে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

এনাম ও জাহিদ দুই বন্ধু। জাহিদ এনামের নিকট কিছু টাকা আমানত রেখেছে। কিছু দিন পর জাহিদ টাকা ফেরৎ চাইলে এনাম আরেক দিন দেবে বলে জানায়। জাহিদ পুনরায় টাকা চাইতে গেলে এনাম বলে, আমি এখন টাকা দিতে পারব না।

৬। শরীআতের দৃষ্টিতে এনামের কাজটি–

ক. অন্যায় খ. ওয়াদা খেলাপ
গ. আমানতের খেয়ানত ঘ. ভদ্রতার খেলাপ

৭। আমানত বলতে বোঝান হয়েছে–

ক. কিছুদিন পরে টাকা ফেরৎ দেয়া যাবে
খ. একবার ব্যর্থ হলেও দ্বিতীয়বার অবশ্যই ফেরৎ দেবে
গ. টাকা যে অবস্থায় রেখেছে সে অবস্থায় ফেরৎ দেবে
ঘ. বুঝিয়ে বলে টাকা কিছুদিন ব্যবহার করার পর ফেরৎ দেবে

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। তোফাজ্জল সাহেব একটি গার্মেন্টস শিল্পের মালিক। অনেক শ্রমিক তার প্রতিষ্ঠানে কাজ করে। তারা তাদের প্রাপ্য ঠিকভাবে পায়না। এ নিয়ে শ্রমিকদের মাঝে অসন্তোষ দেখা দেয় এবং তারা একদিন কাজে বিরত থাকে। তোফাজ্জল সাহেব তার এক বন্ধুর সাথে আলাপ করলে তিনি বলেন, "শ্রমিকদের হক বড় ভয়ের বিষয়। তোমাকে শ্রমের মর্যাদা বুঝতে হবে। কারণ, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের হক তোমার কাছ থেকে আদায় করে নেবেন।" হাদীসে আছে,"মজুরের মজুরী তার ঘাম শুকানোর আগেই পরিশোধ করে দাও।"

ক. শ্রম কী ?
খ. শ্রমের মর্যাদা বলতে কী বোঝানো হয়েছে, ব্যাখ্যা কর।
গ. তোফাজ্জল সাহেব শ্রমিকের মজুরী ঠিকভাবে না দেওয়ায় কী অন্যায় হয়েছে, ব্যাখ্যা কর।
ঘ. শ্রমিকের মজুরী ঘাম শুকানোর আগেই পরিশোধের কথা বলা হয়েছে কেন, ব্যাখ্যা কর।

২। মালিহা ও রাবেয়া সহপাঠী। মালিহা সব সময় সত্য কথা বলে। কিন্তু রাবেয়া তেমন নয়। রাবেয়াকে ক্লাসের কাজ সম্পর্কে জানতে চাইলে বলে– করেছি, দেখতে চাইলে দেখাতে পারে না। একদিন মালিহা রাবেয়ার কাছে জরুরি প্রয়োজনে দশ টাকা ধার চাইলে সে বলে নেই অথচ টিফিন পিরিয়ডে আচার কিনার সময় রাবেয়ার হাতে কয়েকটি দশ টাকার নোট দেখা গেল। এ প্রসঙ্গে মালিহা বলে হাদীসে আছে, তোমরা সত্যবাদিতা রক্ষা কর।

ক. সিদকুন শব্দের অর্থ কী ?
খ. সত্যবাদিতা বলতে কী বোঝ ?
গ. রাবেয়ার কাজগুলোকে সত্যবাদিতার আলোকে ব্যাখ্যা কর।
ঘ. "তোমরা সত্যবাদিতা রক্ষা কর" – এই হাদীসটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

৩। হাসান ও ফায়েজ দু'জন প্রতিবেশী। তাদের সম্পর্ক ভাল ছিল না। একদিন হাসানের একটি ছাগল ফায়েজের বাগানে ঢুকে কিছু গাছ খেয়ে ফেলে। ফায়েজ ক্রুদ্ধ হয়ে ছাগলটিকে মারতে মারতে দুটো পা ভেঙ্গে দেয়। ফলে তাদের সম্পর্ক আরও খারাপ হয়। বিষয়টি নিয়ে ভাবতে গিয়ে হাসানের একটি হাদীস মনে পড়ে, "সিরকা মধুকে যেভাবে বিনাশ করে, ক্রোধও ঈমানকে তদ্রুপ নষ্ট করে।"

ক. ক্রোধ অর্থ কী ?
খ. ক্রোধের একটি ক্ষতিকর অবস্থা ব্যাখ্যা কর।
গ. ক্রোধ সংবরণ করতে ফায়েজকে কী কী উপদেশ দেয়া যেতে পারে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. " সিরকা মধুকে যেভাবে বিনাশ করে ক্রোধ ও ঈমানকে তদ্রুপ নষ্ট করে"– হাদীসটি বিশ্লেষণ কর।

পঞ্চম অধ্যায়

আদর্শ জীবনচরিত

হযরত ইসমাঈল (আ)

পরিচয়

হযরত ইসমাঈল (আ) ছিলেন বিশিষ্ট নবী হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পুত্র। তাঁর মাতার নাম বিবি হাযিরা। হযরত ইবরাহীম (আ) এর বয়স যখন ছিয়াশি তখন হযরত ইসমাঈল (আ) জন্মগ্রহণ করেন।

নির্বাসন

আল্লাহর কি মহিমা! তিনি ইবরাহীম (আ) কে নির্দেশ দিলেন, শিশু পুত্রসহ হাযিরাকে নির্বাসন দিতে। তাই তিনি জনমানবহীন মক্কা উপত্যকায় তাঁদের নির্বাসন দেন। খাদ্য হিসেবে রেখে যান শুধু কিছু খেজুর আর এক মশ্‌ক পানি।

কয়েকদিনের মধ্যে হযরত ইবরাহীম (আ) এর রেখে যাওয়া খেজুর ও পানি ফুরিয়ে গেল। বিবি হাযিরা ও শিশু ইসমাঈল ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়লেন। পানির পিপাসায় শিশু পুত্র ইসমাঈলের প্রাণ ওষ্ঠাগত। তা দেখে মা হাযিরা পানির জন্য সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে উদভ্রান্তের ন্যায় ছুটাছুটি করতে লাগলেন। এদিকে ইসমাঈল তৃষ্ণায় হাত-পা ছুড়াছুড়ি করছিলেন, হঠাৎ করেই পায়ের কাছ থেকে পানি উঠতে লাগল। মা হাযিরা তা দেখে মুগ্ধ হলেন এবং ইসমাঈলকে পানি পান করিয়ে জীবন রক্ষা করলেন। শোকরিয়া জানালেন আল্লাহর নিকট। অলৌকিকভাবে পানি ওঠার স্থানে একটি কূপ সৃষ্টি হয়ে গেল, যার নাম যমযম কূপ। পানি প্রাপ্তির কারণে আস্তে আস্তে সেখানে বিভিন্ন দিক থেকে মানুষ আসতে লাগল। চারপাশে জনবসতি গড়ে উঠল।

কুরবানী

হযরত ইবরাহীম (আ) সুদূর সিরিয়া থেকে মাঝে মাঝে বিবি হাযিরা ও পুত্র ইসমাঈলকে দেখতে আসতেন। একবার এসে তিনি ইসমাঈলকে জানালেন যে, আল্লাহ তাঁকে আল্লাহর রাস্তায় কুরবানী করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এখন তাঁর ইচ্ছা কী ? ইসমাঈলের বয়স তখন ১৩ বছর। ইসমাঈল বলেন, "আব্বা! আমি আপনার যে কোন নির্দেশ মেনে নেব। আল্লাহর নির্দেশ আপনি পালন করুন।" হযরত ইবরাহীম (আ) পুত্র ইসমাঈলকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে তাঁর গলায় ছুরি চালাতে লাগলেন। অলৌকিকভাবে একটি দুম্বা কুরবানী হয়ে গেল, আর ইসমাঈল জীবিত থেকে গেলেন। এদিন থেকেই পশু কুরবানীর রীতি প্রচলিত হয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইসমাঈলের কুরবানীর কথা উল্লেখ করেছেন–

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يٰبُنَيَّ اِنِّيْٓ اَرٰى فِي الْمَنَامِ اَنِّيْٓ اَذْبَحُكَ
فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ط قَالَ يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُسَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَاءَ
اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ

অর্থ : "এরপর সে (ইসমাঈল) যখন পিতার সাথে কাজ করার মত বয়সে উপনীত হলেন, তখন (তিনি) বললেন, হে বৎস! স্বপ্নে আমি তোমাকে যবেহ্ করতে দেখেছি এ বিষয়ে তোমার মতামত কী ? ইসমাঈল বলেন, আব্বা! আপনাকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা সম্পন্ন করুন। ইনশাআল্লাহ আমাকে ধৈর্যশীলই পাবেন।" (সাফ্‌ফাত ৩৭ : ১০২)

কা'বা ঘর নির্মাণে অংশগ্রহণ

আল্লাহর নির্দেশে হযরত ইবরাহীম (আ) কা'বা নির্মাণ করেন। তখন ইসমাঈল (আ) তাঁকে সর্বাত্মক সাহায্য করেন।

উপাধি

ইসমাঈল (আ) ছিলেন উঁচু মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহ তাঁকে ওয়াদা পালনকারী উপাধি দেন। কথিত আছে তিনি এক ব্যক্তির সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, ঐ লোকটি নির্ধারিত স্থানে না আসা পর্যন্ত তিনি তার জন্য অপেক্ষা করবেন। কিন্তু লোকটি কথামত না আসলেও হযরত ইসমাঈল (আ) তিন দিন পর্যন্ত সে স্থানে তার জন্য অপেক্ষা করেন।

বংশধর

হযরত ইসমাঈল (আ) এর বংশধরগণ বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েন। বিখ্যাত কুরাইশ বংশ তাঁরই বংশধর। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) হযরত ইসমাঈল (আ) এর বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

ইনতিকাল

একশত ছত্রিশ বছর বয়সে হযরত ইসমাঈল (আ) মক্কা শরীফে ইনতিকাল করেন।

এ পাঠে আমরা জানলাম

১. হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ) এর পরিচয়।

২. হযরত ইসমাঈল (আ) এর আল্লাহর রাস্তায় ত্যাগ ও কুরবানীর ইতিহাস।

আমরা হযরত ইসমাঈল (আ) এর জীবন ইতিহাস জানব ও বলতে পারব। আমরা তাঁর জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ হব। আমরা আমাদের পিতামাতার নির্দেশ বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নেব। এতে তাঁরা খুশি হবেন। আল্লাহর রহমত আমাদের ওপর বর্ষিত হবে।

হযরত ইউসুফ (আ)

পরিচয়

কেনানের অধিবাসী বিখ্যাত নবী হযরত ইউসুফ (আ) হযরত ইয়া'কূব (আ) এর পুত্র। হযরত ইউসুফ (আ) ছিলেন বারো ভাইয়ের একাদশতম। তিনি ছিলেন অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী, বিনয়ী ও উত্তম চরিত্রগুণে গুণান্বিত।

ভাইদের ষড়যন্ত্র

পিতা হযরত ইয়া'কূব (আ) পুত্রদের মধ্যে ইউসুফকে বেশি ভালবাসতেন।এ কারণে ভাইয়েরা ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে। অবশেষে তারা ষড়যন্ত্র করে একদিন পিতার নিকট খেলার কথা বলে ইউসুফকে জনমানবশূন্য একটি মাঠে নিয়ে যায়। তারা তাঁকে মারপিট করে একটি গভীর কূপে ফেলে দেয়। বাড়ি এসে পিতাকে জানায়, "আমরা যখন খেলাধুলায় লিপ্ত ছিলাম, তখন ইউসুফকে বাঘে নিয়ে যায় এবং খেয়ে ফেলে। এই যে দেখুন, তার রক্তমাখা জামা।" জামাটি রক্তমাখা থাকলেও ছেঁড়া ছিল না। ইয়া'কূব (আ) পুত্রদের এ কথায় বিশ্বাস করতে পারলেন না। তিনি তাদের এ মিথ্যা কথায় অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। ক্রোধ প্রকাশ করলেন না বরং ধৈর্যধারণ করার সংকল্প করে বললেন, "ধৈর্যই উত্তম, আর তোমরা যা প্রকাশ করেছ সে বিষয়ে আল্লাহর নিকট সাহায্য কামনা করছি।" (ইউসুফ ১২ : ১৮)

বাজারে বিক্রয়

যে কূপে ইউসুফকে নিক্ষেপ করা হয়েছিল ঐ কূপের পাশ দিয়ে একটি বণিক দল মিসর যাচ্ছিল। তারা পানি ওঠানোর জন্য কূপে বালতি ফেললে ইউসুফ বালতিটির রশি ধরে ওপরে উঠে আসলেন। বণিকেরা ইউসুফকে মিসরে নিয়ে ক্রীতদাস বলে মিসরের অর্থমন্ত্রী আযীয এর নিকট বিক্রি করে দেয়। আযীয ছিলেন নিঃসন্তান। তিনি দাস হিসেবে

ইউসুফকে ক্রয় করলেও পুত্রের মত আদর যত্নে লালন-পালন করতে থাকেন। যুবক বয়সে মিথ্যা অপবাদের দরুন ইউসুফ কারারুদ্ধ হন। তিনি আল্লাহ প্রদত্ত অগাধ পাণ্ডিত্যের কারণে কারাগারে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে ওঠেন। তিনি স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যাও বলতে পারতেন।

স্বপ্নের ব্যাখ্যা বর্ণনা

মিসরের বাদশাহ একবার এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেন। তিনি দেখতে পান যে, সাতটি মোটাতাজা গাভীকে সাতটি শীর্ণকায় গাভী খেয়ে ফেলছে। আরও দেখতে পান সাতটি সবুজ শস্য শীষ ও সাতটি শুষ্ক শীষ। তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করলেন। কিন্তু এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা দরবারের আমীর-ওমরা, জ্ঞানী-গুণী কেউই দিতে পারলেন না। অবশেষে তিনি হযরত ইউসুফের শরণাপন্ন হলেন। ইউসুফ (আ) এ স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বললেন–সাত বছর রাজ্যে প্রচুর ফসল ফলবে, সচ্ছলতা থাকবে, আর সাত বছর একটানা ভীষণ দুর্ভিক্ষ চলবে। তিনি দুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচার উপায়ও বলে দিলেন। উদ্বৃত্ত খাদ্য জমা করে রাখার পরামর্শ দিলেন। ইউসুফ (আ) এর ব্যাখ্যা শুনে বাদশাহ খুবই মুগ্ধ হলেন। তাঁর বিরুদ্ধে সকল অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিলেন। তাঁকে সম্মানের সাথে রাজদরবারে স্থান দিলেন।

মন্ত্রী পদে নিয়োগ

বাদশাহ ইউসুফ (আ) কে অর্থমন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন। এদিকে দুর্ভিক্ষ পীড়িত হয়ে ইউসুফ (আ) এর ভাইয়েরা তিনবার খাদ্যশস্যের জন্য মিসরে হাজির হয়। ইউসুফ (আ) প্রথম বারেই তাদের চিনে ফেলেন। নিজের পরিচয় গোপন রাখেন। মানবিক কারণে তিনি প্রত্যেকবারই তাদের জন্য পূর্ণ খাদ্যশস্য বরাদ্দ করেন। দ্বিতীয়বার কৌশলে আপন সহোদরকে নিজের কাছে রেখে দেন। তৃতীয়বার ইউসুফ (আ) ভাইদের নিকট আত্মপরিচয় দেন। তখন তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং বলে, "আল্লাহর শপথ, নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাকে আমাদের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং নিশ্চয়ই আমরা অপরাধী ছিলাম।" ইউসুফ (আ) ভাইদের ক্ষমা করে দরদভরা কণ্ঠে বলেন–

لَاتَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ط يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ ز وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ۝

অর্থ : "আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। তিনি শ্রেষ্ঠ দয়ালু।" (ইউসুফ ১২ : ৯২)

এরপর ইউসুফ (আ) তাঁর ভাইদেরকে পিতা ও পরিবারের লোকজনসহ মিসরে আসবার আমন্ত্রণ জানান। পিতামাতা ও অন্যদের নিয়ে ভাইয়েরা মিসরে আগমন করেন। ইউসুফ (আ) তাঁদের সম্মানের সাথে গ্রহণ করেন। মিলেমিশে সকলে বসবাস করতে থাকেন। ১১০ বছর বয়সে হযরত ইউসুফ (আ) ইনতিকাল করেন।

এ পাঠে আমরা জানলাম

১. হযরত ইউসুফ (আ) এর পরিচয়।

২. হযরত ইউসুফ (আ) এর ক্ষমার দৃষ্টান্ত।

৩. কঠিন বিপদে ধৈর্যধারণ করে আল্লাহর ওপর ভরসা রাখলে ধৈর্যের ফল পাওয়া যায়।

আমরা হযরত ইউসুফ (আ) এর জীবন কাহিনী জানব ও বলতে পারব। আমরা তাঁর ক্ষমার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হব।

হযরত আয়্যূব (আ)

পরিচয়

হযরত আয়্যূব (আ) ছিলেন একজন বিখ্যাত নবী। তিনি ছিলেন অগাধ সম্পদের মালিক। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর ঈমান ও ধৈর্য পরীক্ষা করতে চাইলেন। তাঁর সকল সম্পদ, ঘর-বাড়ি, দালান-কোঠা, ফলের বাগান, সব কিছু বিনষ্ট হয়ে গেল। তিনি নিঃস্ব হয়ে গেলেন। তাঁর সাত কন্যা ও সাত পুত্র সকলেই মৃত্যুবরণ করল। এতসব কিছু ঘটলেও তিনি ধৈর্যহারা হলেন না। তিনি আগের মত ইবাদাত বন্দেগীতেই রত থাকলেন। সবশেষে তাঁর শরীরে ক্ষত রোগ দেখা দিল। শরীরের মাংস পচে গলে পড়তে শুরু করল। শরীরে পোকা ধরল। গ্রামের লোকেরা তাঁকে গ্রাম ছেড়ে যেতে বলল। আত্মীয়-স্বজন সকলে তাঁকে ত্যাগ করে চলে গেল। কিন্তু সঙ্গে থেকে গেলেন সতী-সাধ্বী স্ত্রী রহীমা। তিনি তাঁর সেবা শুশ্রূষা করতে থাকলেন। গ্রামের লোকদের ভয় ও অবজ্ঞার মুখে বিবি রহীমা আল্লাহর নবীকে নিয়ে গ্রামের বাইরে এক স্থানে আশ্রয় নিলেন। স্ত্রী মেহনতের মজুরি দিয়ে তাঁর পানাহার ও প্রয়োজনীয় উপকরণাদি সংগ্রহ করতেন। এভাবে চলে গেল সাত বছর কয়েক মাস। আয়্যূব (আ) সব দুঃখ-কষ্ট সন্তুষ্টচিত্তে সহ্য করে আল্লাহর যিক্রে মশগুল থাকতেন। এজন্য আল্লাহ্ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, "আমি তাঁকে ধৈর্যশীল পেয়েছি, কতই না উত্তম বান্দা তিনি। তিনি ছিলেন আমার অভিমুখী।" (সাদ ৩৮ : ৪৪)

রোগমুক্তি

রোগযন্ত্রণায় ভীষণ কাতর হয়ে এক পর্যায়ে হযরত আয়্যূব (আ) আল্লাহর নিকট রোগমুক্তির জন্য দুআ করলেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন–

"এবং স্মরণ করুন আয়্যুবের কথা, যখন তিনি তাঁর প্রতিপালককে আহবান করে বলেছিলেন, 'আমি দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়েছি, আপনিতো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।" (আম্বিয়া ২১ : ৮৩)

আল্লাহ্ তাআলা আয়্যূব (আ) এর দুআ কবুল করলেন। তিনি তাকে পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করতে বললেন। আঘাতের সাথে সাথে তাঁর পায়ের নিকট থেকে পানি উঠতে লাগল এবং কূপের সৃষ্টি হল। আয়্যূব (আ) ঐ পানি পান করলেন এবং এর দ্বারা গোসল করলেন। মুহূর্তের মধ্যে তাঁর সব রোগ ভাল হয়ে গেল। পূর্বের ন্যায় শরীর সুস্থ হয়ে ওঠল, এমনকি রোগের চিহ্নও থাকল না। এরপর আল্লাহ্ তাঁর বিনষ্ট হয়ে যাওয়া সকল সম্পদ পুনরায় ফিরিয়ে দিলেন। হযরত আয়্যূব (আ) নতুন করে আল্লাহর দীন প্রচার করতে শুরু করলেন। রোগমুক্তির পর তিনি দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন।

এ পাঠে আমরা জানলাম

১. হযরত আয়্যূব (আ) এর পরিচয়।

২. কঠিন বিপদে ধৈর্যধারণ করলে আল্লাহ্ তার প্রতিদান দেন।

আমরা হযরত আয়্যূব (আ) এর পরিচয় জানব ও বলতে পারব। আমরা তাঁর জীবন থেকে বিপদে ধৈর্যধারণ করার শিক্ষা গ্রহণ করব।

হযরত মুহাম্মাদ (স)

পরিচয়

আরবের কুরাইশ বংশে ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবদুল্লাহ এবং মাতার নাম আমেনা। জন্মের পূর্বেই তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন এবং ছয় বছর বয়সে মাতাও ইন্তেকাল করেন। শৈশবে তিনি দাদা আবদুল মুত্তালিব ও চাচা আবূ তালিবের নিকট লালিতপালিত হন।

ধর্ম প্রচার

হযরত মুহাম্মাদ (স) চল্লিশ বছর বয়সে নবুওয়্যাত প্রাপ্ত হন। নবুওয়্যাত প্রাপ্তির পর আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে প্রথম নিকট আত্মীয় স্বজনের কাছে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দিতে লাগলেন। তাঁর দাওয়াতে প্রথমে হযরত খাদীজা (রা), এরপর হযরত আলী (রা) ও হযরত আবূ বক্‌র (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। এ সময়ে মহানবী (স) গোপনে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। এরপর আল্লাহ্ তাঁকে প্রকাশ্যে দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ দেন। তখন তিনি প্রকাশ্যে দাওয়াত দিতে শুরু করেন। একদিন তিনি সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে সকলের উদ্দেশে বললেন, "আমি যদি বলি, এ পাহাড়ের ওপাশে বিরাট শত্রু বাহিনী তোমাদের ওপর হামলার অপেক্ষায় আছে, তাহলে তোমরা বিশ্বাস করবে ?" সবাই বলল, "তুমি আল-আমিন, তোমার কথা অবশ্যই বিশ্বাস করব।" মহানবী (স) বললেন, "এক আল্লাহর ওপর ঈমান আন, তোমরা মুক্তি পাবে।" এ কথা শোনামাত্র সকলে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠল। আবূ লাহাব বলল, "তোমার ধ্বংস হোক, তুমি কি এজন্যই আমাদের ডেকেছ?" তারা তাঁকে গালমন্দ দিতে দিতে চলে গেল। তাঁর বিরোধিতা আরম্ভ করল। তাঁকে পাগল ও যাদুকর আখ্যা দিল। তাঁর এবং তাঁর সঙ্গীদের ওপর নানারকম অত্যাচার নির্যাতন চালাতে লাগল।

মি'রাজ

মক্কার কাফিরদের সীমাহীন অত্যাচারে এবং তায়িফবাসীদের দুর্ব্যবহারে মহানবী (স) যখন নিদারুণ মর্মাহত, ব্যথিত তখন আল্লাহ তাকে মি'রাজের সম্মান দান করেন। মি'রাজ এর অর্থ সিঁড়ি, সোপান, উর্ধ্বগমন। নবুওয়্যাতের একাদশ সনে রজব মাসের ২৭ তারিখে আল্লাহ্ তাআলা মহানবী (স) কে স্বশরীরে অতি অল্প সময়ে মসজিদে হারাম থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস এবং সেখান থেকে উর্ধ্বাকাশ ভ্রমণ করিয়ে আনেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) এর এই ভ্রমণকে মি'রাজ বলে। এ ভ্রমণে মহানবী (স) কে 'বুরাক' ও রফরফ' নামক দুইটি দ্রুতগামী বাহন বহন করে। বায়তুল মুকাদ্দাসে তিনি পূর্ববর্তী নবীগণের সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং তাঁদের ইমাম হয়ে দুই রাকা'আত সালাত আদায় করেন। সেখান থেকে সাত আসমান অতিক্রম করে তিনি আল্লাহর দীদার বা সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নির্দেশ প্রাপ্ত হন। মি'রাজ মহানবী (স) এর জীবনের সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এ ঘটনায় তিনি নতুন কর্মপ্রেরণায় উজ্জীবিত হন। তাই মহানবী (স) এর জীবনে মি'রাজের গুরুত্ব অত্যধিক।

মদীনায় হিজরত

৬২১ খ্রিস্টাব্দে হাজ্জের মৌসুমে মদীনা থেকে ১২ জন লোকের একটি দল মক্কা গমন করেন। গোপনে তারা আকাবা উপত্যকায় মহানবী (স) এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ইসলাম গ্রহণ করেন। এর পরের বছর হাজ্জের সময় মদীনা থেকে ২ জন মহিলাসহ ৭৫ জন সদস্যের অপর একটি দল মহানবী (স) এর সাথে আকাবায় মিলিত হন এবং তাঁর হাতে ইসলাম কবুল করেন। তাঁরা মহানবী (স) কে মদীনা গমনের দাওয়াত দেন এবং তাঁদের সর্বস্ব ত্যাগের বিনিময়ে মহানবী (স) কে রক্ষা করার অঙ্গীকার করেন। মহানবী (স) তাঁদের দাওয়াত গ্রহণ করেন। মক্কায় যখন কুরাইশদের চরম বিরোধিতার কারণে ইসলামের প্রচার প্রসার চূড়ান্তভাবে বাধাগ্রস্ত হতে লাগল তখন তিনি মদীনায় হিজরত করার ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষা করতে থাকেন।

মক্কার কাফিররা যখন দেখল যে, আস্তে আস্তে মুসলমানগণ মক্কা ছেড়ে হিজরত করে চলে যাচ্ছে। মক্কা প্রায় মুসলিম

শূন্য হয়ে পড়েছে তখন তারা মনে করল, মহানবী (স) ও হয়ত দেশ ছেড়ে চলে যাবেন। হযরত মুহাম্মাদ (স) মক্কা ছেড়ে চলে যাবেন এই ভয়ে তারা সকল গোত্র সম্মিলিতভাবে মহানবী (স) কে হত্যার সিদ্ধান্ত নিল। সে অনুসারে তারা রাতের বেলা মহানবী (স) এর ঘর অবরোধ করল। প্রত্যুষে নবীকে হত্যা করার অপেক্ষায় থাকল। কিন্তু আল্লাহর কুদরতে মহানবী (স) তাদের চোখ এড়িয়ে ঘর থেকে বের হলেন। হযরত আবূ বক্‌র (রা) কে সঙ্গে নিয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। গচ্ছিত সম্পদ প্রাপকদের ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য মহানবী (স) হযরত আলী (রা) কে তাঁর ঘরে রেখে যান। কাফিররা ঘরে ঢুকে মহানবী (স) এর বিছানায় হযরত আলী (রা) কে দেখতে পেয়ে ক্রোধে অধীর হল, কিন্তু তখন আর কিছুই করার ছিল না।

মহানবী (স) ও আবূ বক্‌র সিদ্দীক (রা) কিছুদূর অগ্রসর হয়ে মক্কার সাওর পর্বত গুহায় আশ্রয় নিলেন। এদিকে কাফিররা তাঁদের খুঁজতে খুঁজতে একেবারে গুহার মুখে এসে পড়ল। আবূ বক্‌র (রা) গুহার মুখে কাফিরদের গতিবিধি লক্ষ্য করে একটু বিচলিত হয়ে পড়লেন। মহানবী (স) বললেন, "আবূ বক্‌র চিন্তা করো না, আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন।" তিন দিন সাওর পর্বতে অবস্থানের পর মহানবী (স) ৬২২ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে সেপ্টেম্বর মদীনায় পৌঁছেন। মদীনার আবালবৃদ্ধবনিতা তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন।

এ পাঠ থেকে আমরা জানলাম

১. মহানবী (স) এর নবুওয়্যাত প্রাপ্তি ও ইসলাম প্রচার।

২. মি'রাজের পরিচয় ও গুরুত্ব।

৩. মহানবী (স) এর মদীনায় হিজরত।

আমরা মহানবী (স) এর সর্বোত্তম চরিত্রের কথা জানব ও তার গুরুত্ব বুঝব এবং বলতে পারব। আমরা জানব তাঁর আদর্শ অনুসরণের মধ্যে আমাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের সঠিক কল্যাণ নিহিত। আমরা তাঁর আদর্শ অনুসরণে ব্রতী হব।

হযরত হাম্‌যা (রা)

পরিচয়

বিখ্যাত সাহাবী বীরযোদ্ধা হযরত হাম্‌যা (রা) ছিলেন মহানবী (স) এর চাচা। তাঁর ইসলাম গ্রহণ ছিল একটি আকস্মিক ঘটনা।

নবুওয়্যাত প্রাপ্ত হয়ে মহানবী (স) প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার শুরু করলেন। আর এ কারণে কাফিররা শুরু করল বিরোধিতা–নির্যাতন। এরই মধ্যে একদিন মহানবী (স) সাফা পর্বতের পাদদেশে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় ছিলেন। পাপিষ্ঠ আবূ জাহ্‌ল অত্যন্ত আপত্তিকর ভাষায় তাঁকে তিরস্কার ও আঘাত করল। মহানবী (স) আবূ জাহ্‌লকে কিছু না বলে চুপচাপ ঘরে ফিরে এলেন। হাম্‌যা (রা) কেবল শিকার থেকে ফিরেছেন। এ ঘটনা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে সে অবস্থায়ই তিনি কা'বা ঘরের চত্বরে হাজির হন। সেখানে তিনি অন্যান্য কুরাইশ নেতাদের সাথে আবূ জাহ্‌লকে দেখতে পেয়ে বাঘের ন্যায় গর্জন করে উঠলেন। ধনুক দ্বারা আবূ জাহ্‌লের মাথায় আঘাত করতে করতে বললেন, "এত বড় সাহস যে, আমার ভ্রাতুষ্পুত্রকে গালি-গালাজ ও তিরস্কার করতে পার।" আবূ জাহ্‌ল বলল, "আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলে বলেইতো আমি এ কাজ করেছি।" হাম্‌যা বললেন, "তবে শোন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স) পড়ে আমিও মুহাম্মাদের ধর্ম গ্রহণ করলাম।" হাম্‌যা (রা) মহানবী (স) এর নিকট তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয়ে সব খুলে বললেন এবং নিজের ইসলাম গ্রহণের কথাও জানালেন। হাম্‌যা (রা) এর ন্যায় বীরযোদ্ধার ইসলাম গ্রহণে মহানবী (স) অত্যন্ত খুশি হলেন।

বীরত্ব

হযরত হাম্‌যা (রা) ছিলেন পরাক্রমশালী সাহসী যোদ্ধা। তাঁর অতুলনীয় বীরত্বের জন্য তাঁকে "আল্লাহ ও রাসূলের সিংহ" আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। ইসলাম গ্রহণ করে হাম্‌যা (রা) মহানবী (স) ও ইসলামের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেন। তিনি বিভিন্ন সংকট কালে মহানবী (স) এর সঙ্গে ছায়ার মত ছিলেন। মহানবী (স) যখন হযরত আর্‌কাম (রা) এর গৃহে গোপনে ইসলাম প্রচার কার্যে রত ছিলেন, তখন মহানবী (স) ও মুসলমানদের নিরাপত্তার দায়িত্ব ছিল হাম্‌যা (রা) এর ওপর। হযরত হাম্‌যা (রা) বদ্‌রের যুদ্ধের সময় মহাবীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সে যুদ্ধে আবূ জাহ্‌লসহ অনেক কুরাইশ নেতা মুসলমানদের হাতে নিহত হয়েছিল।

উহূদ যুদ্ধের সময় কাফিরদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল হাম্‌যা (রা) কে হত্যা করা। কারণ বদ্‌র যুদ্ধে হাম্‌যার তরবারির আঘাতে অনেক কুরাইশ বীর নিহত হয়েছিল। তাই যুদ্ধের এক পর্যায়ে হাব্‌শী ক্রীতদাস ওয়াহ্‌শী ইব্‌ন হার্‌ব এর বর্শার আঘাতে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন ও শাহাদাতবরণ করেন।

আমরা হাম্‌যা (রা) এর অমিত তেজবিক্রমের কথা জানব ও বলতে পারব। আমরা তাঁর আদর্শ অনুসরণ করব।

হযরত ফাতিমা (রা)

পরিচয়

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স) এবং তাঁর প্রথমা স্ত্রী খাদীজা (রা) এর কনিষ্ঠা কন্যা ছিলেন হযরত ফাতিমা (রা)। তাঁর জন্ম ৬০৫ খ্রীস্টাব্দে মক্কা নগরীতে। শৈশব হতেই তিনি যেমন ছিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার অধিকারিণী, তেমনি ছিলেন সর্বপ্রকার সৎ চরিত্রের অধিকারিণী। তাঁর উপাধি ছিল 'যাহ্‌রা' (অনিন্দ্য সুন্দরী, পরমা লাবণ্যময়ী) ও বাতুল (পবিত্র, সংসারে অনাসক্ত)। মহানবী (স) তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। হিজ্‌রি দ্বিতীয় সনে বদ্‌র যুদ্ধের পর হযরত আলী (রা) এর সাথে তাঁর শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়।

অনাড়ম্বর জীবনযাপন

হযরত ফাতিমা (রা) এর স্বামী হযরত আলী (রা) ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র। কঠোর পরিশ্রম করে তিনি আহার্য জোটাতেন। অভাবের তাড়নায় কখনও একবেলা খেয়ে, কখনও না খেয়ে তাঁদের দিন কাটত। কখনওবা দুই তিন দিন অনাহারে কাটাতেন। তবুও ধৈর্যহারা হতেন না। আত্মতৃপ্তিতে সর্বদা সমুজ্জ্বল থাকতেন। ফাতিমা (রা) সংসারের সকল কাজ নিজ হাতেই করতেন। সন্তান পালন, স্বামীর সেবাসহ যাবতীয় কাজ তিনিই করতেন। যাঁতা পিষতে পিষতে তাঁর হাতে ফোস্‌কা পড়ে যেত। তাঁর কোন দাস-দাসী ছিল না। কোন সাজগোজ, জাঁকজমক তিনি পছন্দ করতেন না। একেবারে সাদাসিধে চলতেন তিনি।

দানশীলতা

এত অভাবের মধ্যেও ফাতিমা (রা) ছিলেন অত্যন্ত দানশীল। কখনও ভিক্ষুককে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতেন না। দুই তিন দিন অনাহারের পরে সামান্য আহারের ব্যবস্থা হলেও যদি ভিক্ষুক দরজায় উপস্থিত হত তৎক্ষণাৎ তা ভিক্ষুককে দিয়ে দিতেন। নিজে শুধু পানি পান করে দিন কাটিয়ে দিতেন।

পিতার প্রতি অনুরাগ

মহানবী (স) এর ইনতিকালের সময় ফাতিমা (রা) কে ডেকে যখন তিনি বললেন, "মা আমার আর সময় নেই, আমি তোমাদের ছেড়ে চলে যাব।" ফাতিমা (রা) পাগলপ্রায় হয়ে কান্না শুরু করেন। নবী (স) ফাতিমার এ অবস্থা দেখে আবার তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, "মা পরিবারের সকলের মধ্যে তুমিই আমার সাথে আগে মিলিত হবে।" ফাতিমা (রা) একথা শুনে খুশিতে হেসে ওঠলেন। হযরত ফাতিমা (রা) আদর্শ পিতামাতার সমস্ত গুণই অর্জন

করেছিলেন। সত্যনিষ্ঠা, ধৈর্য, দানশীলতা, লজ্জাশীলতা, পতিভক্তি, আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতা প্রভৃতি মহৎ গুণাবলির তিনি অধিকারিণী ছিলেন। তিনি বেহেশতের নারীকুলের সর্দার বা নেত্রী। ফাতিমা (রা) ছিলেন নবীজীর কলিজার টুকরো। তিনি বলেছেন, "যে ফাতিমাকে কষ্ট দেয় সে আমাকেই কষ্ট দেয়।" (বুখারী)। হযরত ফাতিমা (রা) ছিলেন ইমাম হাসান (রা) ও ইমাম হুসাইন (রা) এর আম্মা।

বিশ্বনারী জাতির আদর্শ হযরত ফাতিমা (রা) মহানবী (স) এর ইনতিকালের ছয় মাস পর ১১ হিজরি মোতাবেক ৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।

আমরা ফাতিমা (রা) এর জীবন কাহিনী জানব ও বলতে পারব। তাঁর জীবনাদর্শ অনুসরণ করব।

হযরত বিলাল (রা)

পরিচয়

হযরত বিলাল (রা) ছিলেন আবিসিনিয়ার অধিবাসী একজন ক্রীতদাস। তাঁর পিতার নাম রিবাহ্ এবং মাতার নাম ছিল হামামা। আবূ আব্দুল্লাহ্ ছিল তাঁর ডাকনাম। উমাইয়া ইব্ন খালফ নামক এক ব্যক্তির ক্রীতদাস ছিলেন বিলাল। তিনি ইসলামের প্রাথমিক যুগেই মুসলমান হয়েছিলেন।

নির্যাতন ভোগ

ইসলাম গ্রহণের কারণে বিলালের মনিব তাঁর ওপর অবর্ণনীয় নির্যাতন চালায় এবং ইসলাম ত্যাগের জন্য চাপ সৃষ্টি করে। বিলাল দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন, "নির্যাতন যত কঠোরই হোক না কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত দেহে প্রাণ থাকবে ততক্ষণ ঈমান ত্যাগ করব না।" বিলালের দৃঢ়তা দেখে মনিব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং অমানবিক নির্যাতনে তাঁকে জর্জরিত করে। অভুক্ত রেখে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিলালকে নির্মমভাবে মারধোর করা হত। এতে তাঁর শরীরের বিভিন্ন স্থান ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হত। এ অবস্থায় যখন সন্ধ্যা নেমে আসত তখন পশুর মত গলায় রশি বেঁধে দুর্গন্ধময় কক্ষে রেখে দেওয়া হত। কখনওবা মরুভূমির উত্তপ্ত বালুতে বিলালকে চিৎ করে সূর্যের দিকে মুখ করে শুইয়ে রাখা হত। তার বুকের ওপর বড় বড় পাথরখন্ড রেখে দেওয়া হত। বিলাল তখন যন্ত্রণায় ছটফট করতেন তবুও মনিবের সামান্য দয়া হত না। এ অবস্থায়ও বিলাল (রা) সর্বদা 'আহাদ' 'আহাদ' ("আল্লাহ্ এক", "আল্লাহ্ এক") বলতে থাকতেন। একথা শুনে মনিবের রাগ বেড়ে যেত, নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দিত। কখনও কখনও বিলালের মনিব পাড়ার দুষ্ট ছেলেদের ডেকে এনে বিলালের গলায় রশি বেঁধে তাদের হাতে দিয়ে দিত।

মহানবী (স) বিলালের ওপর নির্যাতনের সংবাদ শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। কিন্তু করার কিছুই ছিল না। একদিন হযরত আবূ বক্‌র (রা) সেপথ দিয়ে যাওয়ার সময় বিলাল (রা) এর ওপর নির্যাতনের বীভৎস অবস্থা দেখে অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে পড়েন। এরপর তিনি বিপুল অর্থের বিনিময়ে বিলাল (রা) কে তাঁর অত্যাচারী মনিবের নিকট থেকে ক্রয় করে আযাদ করে দেন। এতে বিলালের চোখ মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠে। সকল বেদনা তিনি ভুলে যান।

বিলাল মহানবী (স) এর নির্দেশে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। তিনি মহানবী (স) এর সঙ্গী হতেন। ঈদ বা কোন অনুষ্ঠানে গমনকালে মহানবী (স) এর সামনে সামনে তার লাঠি নিয়ে চলতেন বিলাল (রা)। তিনি যুদ্ধের সময় রসদখানার দায়িত্বে থাকতেন। বিলালকে তাই মহানবী (স) এর খাযিন বা কোষাগার রক্ষক বলে আখ্যায়িত করা হয়। মদীনায় হিজরতের পর আযানের প্রথা চালু হলে মহানবী (স) তাঁকে সর্বপ্রথম মুয়ায্যিন নিযুক্ত করেন। মক্কা বিজয়কালে নবীজীর নির্দেশে কা'বা শরীফের ছাদে দাঁড়িয়ে আযান দেওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন বিলাল (রা)।

মহানবী (স) বিলালকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। ২০ হিজরি মোতাবেক ৬৪১ খ্রিস্টাব্দে ৬০ বছর বয়সে তিনি দামিশ্‌কে ইনতিকাল করেন।

আমরা হযরত বিলাল (রা) এর আদর্শ অনুসরণ করব। শত বাধাবিপত্তি এলেও আমরা ন্যায় ও সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকব। অসত্য ও অন্যায়কে মেনে নেব না।

হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)

সংক্ষিপ্ত জীবন

বিখ্যাত সাহাবী মহাবীর হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ কুরাইশ বংশের মাখ্যূম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতা লুবাবা বিন্তু হারিস ছিলেন নবী কারীম (স) এর সহধর্মিনী হযরত মাইমূনা (রা) এর বোন। এ দিক দিয়ে নবী কারীম (স) ছিলেন তাঁর খালুজান। কিশোর বয়সেই তিনি অশ্ব-চালনা, তীরন্দাযী, তলোয়ার চালনায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন। ৮ম হিজরি সনে তিনি ইসলাম কবুল করেন। তিনি যেমন ছিলেন বীর সেনানী, তেমনি ছিলেন রণকৌশলী। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি কাফিরদের দলভুক্ত হয়ে মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন। উহূদ যুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন কাফিরদের দলে। তাঁর সুনিপুণ যুদ্ধ পরিচালনায় মুসলমানগণ এক পর্যায়ে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর সুদক্ষ পরিচালনায় মুসলিম বাহিনী বিভিন্ন রণাঙ্গনে বিজয়ের গৌরব অর্জন করেন।

বীরত্ব ও রণকৌশল

মূতার যুদ্ধে তিনি অসীম বীরত্ব ও অপূর্ব রণকৌশল প্রদর্শন করেন। ৮ম হিজরি সনে মূতার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে মুসলমানগণ প্রথম পর্যায়ে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন। একে একে তিনজন মুসলিম সেনাপতি শহীদ হন। এতে মুসলিম বাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে পড়ে। এ সংকটময় মুহূর্তে হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) বিস্ময়কর উদ্দীপনা ও শৌর্য বীর্য প্রদর্শন করতে থাকেন। এতে মুসলিম বাহিনীর উৎসাহ বহুগুণে বেড়ে যায়। তারা নতুন উদ্যমে যুদ্ধ করতে থাকে। এছাড়া তিনি মুসলিম বাহিনীকে সম্পূর্ণ নতুন করে সাজান। সম্মুখ ভাগের সৈন্যদলকে পেছনের সারিতে এবং পেছনের সারির সৈন্যদলকে অগ্রভাগে, ডানদিকের সৈন্যদলকে বামপাশে এবং বামপাশের সৈন্যদলকে ডানপাশে স্থাপন করেন। এ দৃশ্য দেখে কাফির সৈন্যদল বিচলিত হয়ে পড়ে। তারা ভাবল, মুসলমানগণ মদীনা থেকে নতুন সৈন্য আমদানী করেছে।

তাই তারা সহসা যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পলায়ন করল। মুসলমানগণ বিজয়ী হলেন। মূতার যুদ্ধে হযরত খালিদ (রা) এর বীরত্ব ও সাহসিকতায় মুগ্ধ হয়ে মহানবী (স) তাঁকে উপাধি দেন 'সাইফুল্লাহ' বা আল্লাহর তরবারি। তিনি মক্কা বিজয়ে অংশগ্রহণ করেন। নবম হিজরিতে দুমাতুল জানদালের খৃষ্টান রাজার বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। দশম হিজরিতে নাজ্রানে অভিযান পরিচালনা করেন।

মহানবী (স) এর ইনতিকালের পর হযরত আবূ বকর (রা) খলীফা হয়ে তিনি খালিদ ইব্ন ওয়ালীদকে সেনাপতির দায়িত্ব প্রদান করেন। একাদশ হিজরিতে ভণ্ডনবী তুলাইহাকে দমনের জন্য খালিদ ইব্ন ওয়ালীদকে হযরত আবূ বক্র (রা) প্রেরণ করেন। এছাড়াও তিনি মুসাইলিমা কায্যাব, সাজাহ্সহ অন্যান্য ভণ্ডনবীদের দমন করে ইসলামী রাষ্ট্রে শান্তি ফিরিয়ে আনেন। তিনি পারস্য, সিরিয়া ও দামিশ্ককে সফল অভিযান পরিচালনা করেন।

সেনাপতির পদ থেকে অপসারণ

৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে দামিশ্ক জয়ের প্রাক্কালে হযরত উমার (রা) তাঁকে সেনাপতির পদ থেকে অপসারণ করেন। ময়দানে যুদ্ধ পরিচালনারত অবস্থায় তিনি তাঁর পদচ্যুতি এবং তাঁর পদে আবূ উবাইদা ইবনুল জার্রাহ্ (রা) এর নিয়োগপত্র প্রাপ্ত হন। সাথে সাথে তিনি বাহিনী প্রধানের প্রতীক চিহ্ন খুলে আবূ উবাইদাকে দিয়ে দেন এবং নিজে সাধারণ সৈনিকের ন্যায় সন্তুষ্টচিত্তে যুদ্ধে লিপ্ত হন। সত্যিকার মুসলমান ব্যক্তি পদের জন্য নয় বরং ইসলামের জন্য যুদ্ধ করতে পারাকেই গৌরবের বিষয় মনে করে থাকেন। তাইতো ইসলামের খিদমতের জন্য উৎসর্গকৃত প্রাণ খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) সেনাপ্রধানের পদ থেকে অপসারিত হয়েও সন্তুষ্টচিত্তে একজন সাধারণ সৈনিকের ন্যায় যুদ্ধ করেন।

খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) ইসলামের খিদমতে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। ইসলামের প্রচার ও প্রসারে তার অবদান অপরিসীম।

২১ হিজরি মোতাবেক ৬৪১ খ্রিষ্টাব্দে ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ মহাবীর হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) মদীনায় ইনতিকাল করেন।

আমরা হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) এর শৌর্য-বীর্য ও যুদ্ধের ময়দানে তাঁর কৃতিত্বের কথা জানব ও বলতে পারব। আমরা তার আদর্শ অনুসরণ করব।

হযরত ইমাম শাফিঈ (র)

বিশ্ববিখ্যাত জ্ঞান তাপস ইমাম শাফিঈ (র) এর পূর্ণ নাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন ইদ্রীস আশ শাফিঈ। তাঁর নাম অনুসারেই তার প্রতিষ্ঠিত মাযহাবের নামকরণ করা হয়েছে শাফেঈ মাযহাব। তিনি ছিলেন মক্কার কুরাইশ বংশের হাশিমী গোত্রভুক্ত এবং নবী কারীম (স) এর দূর সম্পর্কের আত্মীয়। ১৫০ হিজরি মোতাবেক ৭৬৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ফিলিস্তিনের গাযা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে। এরপর তাঁর মাতা তাঁকে মক্কায় নিয়ে আসেন। এখানে অত্যন্ত অস্বচ্ছলতার মধ্যে তাঁদের জীবন কাটে। প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী শাফিঈ এর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় মক্কা শহরেই। মাত্র সাত বছর বয়সে তিনি পবিত্র কুরআন হিফ্য করেন। তারপর আরবি ভাষা ও প্রাচীন আরবি কবিতা শিক্ষা করেন। এরপর মক্কায় প্রখ্যাত আলেমগণের নিকট হাদীস, ফিক্হ ও অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। এ সময় তিনি বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ 'মুয়াত্তা সম্পূর্ণ মুখস্থ করে ফেলেন। কুড়ি বছর বয়সে তিনি মদীনায় গমন করেন এবং সেখানে দীর্ঘকাল অবস্থান করে ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (র) এর নিকট থেকে হাদীসসহ ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন।

শিক্ষা জীবন শেষ করে তিনি ইয়ামনে গমন করে একটি চাকুরী গ্রহণ করেন। কিছুকাল চাকুরী করার পর পুনরায় জ্ঞান অর্জনের জন্য বিখ্যাত আলিম মুহাম্মাদ ইব্ন হাসান আশ-শাইবানী (র) এর নিকট হাজির হন। সেখানে কিছুকাল অবস্থান করে তিনি বাগদাদ গমন করেন এবং শিক্ষকতায় নিয়োজিত হন। এরপর মিসর গমন করেন। এখানে গোলযোগ দেখা দেওয়ায় তিনি মক্কা শরীফ চলে যান। ২০০ হিজরিতে পুনরায় মিসর গমন করেন। তিনি যেখানেই যেতেন সেখানেই হাদীস ও ফিক্হ শাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। বহু সংখ্যক জ্ঞানী-গুণী তাঁর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করে জগৎজোড়া খ্যাতি অর্জন করেন। ইমাম শাফিঈ একই সাথে বিখ্যাত হাদীস বিশারদ এবং ইসলামী আইনবিদ ছিলেন। উসূলে ফিক্হ বা ইসলামী আইনশাস্ত্রের মূলনীতি নামক শাস্ত্রের তিনি ছিলেন প্রবর্তক। তিনি হাদীস, ফিক্হ, উসূলে ফিক্হ ও অন্যান্য ইসলামী জ্ঞানের ওপর বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তার রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে সুবৃহৎ গ্রন্থ "কিতাবুল উম্মত" জগৎখ্যাত।

২০৪ হিজরি মোতাবেক ৮২০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মিসরের ফুসতাত নগরে ইনতিকাল করেন।

আমরা ইমাম শাফিঈ (র) এর জীবন ইতিহাস জানব ও বলতে পারব। আমরা তাঁর জ্ঞান দ্বারা অনুপ্রাণিত হব।

হযরত মুঈনুদ্দীন চিশতী (র)

সংক্ষিপ্ত জীবনী

ইরানের সীস্তান অঞ্চলের "সানজার" গ্রামে বিশ্ববিখ্যাত কামিল ওলি হযরত মুঈনুদ্দীন হাসান চিশ্তী (র) ৫৩৭ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম খাজা গিয়াসুদ্দীন (র)। তাঁকে আফ্তাবে হিন্দ (ভারত সূর্য), সুলতানুল হিন্দ (ভারতের আধ্যাত্মিক সম্রাট), গরীব নওয়ায (গরীব দরদী) ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করা হয়। শিশু বয়সেই তার মধ্যে একজন অতি উন্নত চরিত্রের গুণাবলি ফুটে উঠেছিল।

শিক্ষা

তিনি নয় বছর বয়সেই পবিত্র কুরআনের হাফিয হন। এরপর তাফ্সীর, হাদীস, ফিক্হসহ ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। বিখ্যাত ওলি হযরত উস্মান হারুনী (র) এর সান্নিধ্যে হাজির হয়ে এখানে তিনি দীর্ঘদিন অবস্থান করেন। ওখান থেকে তিনি মা'রিফাতের সর্বোচ্চ জ্ঞান লাভ করেন। এরপর পীরের নির্দেশে হিদায়াতের কাজে দেশ-বিদেশে সফরে বের হন। তিনি পীরের দরবার হতে বিদায় নিয়ে মক্কা শরীফ হয়ে মদীনায় হাজির হন। তারপর তিনি ভারতবর্ষের দিকে রওনা হন। তখন ভারতবর্ষে চলছিল

অত্যাচারী হিন্দু শাসকদের কুশাসন। তিনি তাই প্রথমেই দিল্লী হাজির হন। সেখান থেকে আজমীর শরীফ এসে অবস্থান করেন। তার হিদায়াতে দলে দলে লোক ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে। ফলে সেখানকার হিন্দুরাজা স্বীয় রাজ্য হারানোর ভয়ে মুঈনুদ্দীন চিশ্‌তী ও তার অনুসারীদের ওপর নানা রকম অত্যাচার করতে চেষ্টা করে। কিন্তু মুঈনুদ্দীন চিশ্‌তীর কারামতের কাছে তার কোন কৌশলই ফলপ্রসূ হয়নি। বরং মুঈনুদ্দীন চিশ্‌তী (র) এর অনুসারীদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

অতঃপর মুঈনুদ্দীন চিশ্‌তী (র) স্বাধীনভাবে ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন। তাঁর প্রচারের ফলে লাখ লাখ অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেন। মুসলমানগণ শিরক বিদআতসহ সর্বপ্রকার কুসংস্কার ত্যাগ করে পুতঃপবিত্র ও সাচ্চা মুসলিমে পরিণত হন। ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচারে তাঁর অবদান চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

চারিত্রিক মাধুর্য

হযরত মুঈনুদ্দীন চিশ্‌তী (র) ছিলেন সর্বপ্রকার উত্তম চরিত্রগুণে গুণান্বিত। গরীব-দুঃখীদের তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন। অসংখ্য অসহায়, আশ্রয়হীন দরিদ্র মানুষ তাঁর দরবারে অবস্থান করত। লক্ষ লক্ষ অমুসলিম যে তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তা কোন যুদ্ধের ফলে নয় বরং তাঁর চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হয়েই। তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ হচ্ছে 'আনীসুল আর্‌ওয়াহ'। মহান ওলি হযরত মুঈনুদ্দীন চিশ্‌তী (র) ৬৩৩ হিজরি সনে ইনতিকাল করেন। আজমী তাঁর খানকার পাশেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

ইসলামের প্রচার ও প্রসার এবং আধ্যাত্মিক সাধনায় মুঈনুদ্দীন চিশ্‌তী (র) রেখে গেছেন এক অনুকরণীয় আদর্শ। আমরা তাঁর আদর্শ অনুসরণ করব।

শাইখ শারফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা (র)

পরিচয়

প্রাচীন পূর্ব বাংলায় কুরআন-হাদীসের শিক্ষা বিস্তারে যাঁর অবদান ছিল অপরিসীম, তিনি হলেন শাইখ শারফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা (র)। তিনি বর্তমান উজবেকিস্তান প্রজাতন্ত্রের বুখারা অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন বিখ্যাত আলিম।

শিক্ষা

অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী আবূ তাওয়ামা (র) কুরআন, হাদীস, ফিক্‌হ শাস্ত্রসহ ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি বিশেষভাবে হাদীস গ্রন্থ বুখারী শরীফের ব্যাখ্যায় প্রসিদ্ধি লাভ করেন। স্বদেশে উচ্চ শিক্ষা সমাপ্ত করেও আবূ তাওয়ামা (র) এর জ্ঞান পিপাসা মিটল না, তাই তিনি ইরানের খুরাসান গমন করেন। সেখানে তিনি ইসলামী জ্ঞানের সাথে সাথে অন্যান্য বিষয়েও উচ্চ শিক্ষা অর্জন করেন। অল্প সময়ের মধ্যে তার সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

শিক্ষা প্রচার

শিক্ষা গ্রহণ সমাপ্ত করে আবূ তাওয়ামা (র) ইসলামী শিক্ষা দান ও প্রচারে ব্রতী হন। খুরাসান থেকে তিনি এ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অঞ্চল সফর করে দিল্লীতে এসে পৌছেন। সেখানে তিনি একটি মসজিদের সাথে মাদরাসা স্থাপন করে কুরআন-হাদীসসহ ইসলামী শিক্ষা প্রচার করতে শুরু করেন। কিছু দিনের মধ্যে দূর-দূরান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা লাভের জন্য সেখানে হাজির হতে থাকে। তখনকার দিল্লীর সুলতান গিয়াস উদ্দীন বলবন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন।

তিনি আবূ তাওয়ামা (র) এর সুখ্যাতির কথা শ্রবণ করে মুগ্ধ হন। শিক্ষা লাভের জন্য তিনিও মাঝে মাঝে তাঁর শিক্ষায়তনে উপস্থিত হতেন।

ষড়যন্ত্র

আবূ তাওয়ামা (র) এর সম্মান ও সুখ্যাতি কতিপয় দুষ্ট লোকের ঈর্ষার কারণ হয়। তারা বাদশাহকে নানারূপ কুপরামর্শ দিতে থাকে। তারা তাঁকে বাদশাহের সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বী বলে সাব্যস্ত করে। অবশেষে সুলতান তাকে দিল্লী ত্যাগ করতে বলেন। তিনি দিল্লী থেকে পূর্ব বাংলার তৎকালীন রাজধানী সোনারগাঁয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হন। ৬৬৮ হিজরি সনে তিনি সোনারগাঁও উপস্থিত হন এবং একটি বৃহৎ মাদরাসা স্থাপন করে শিক্ষাদান শুরু করেন। অল্পদিনের মধ্যেই চারদিকে মাদরাসার সুনাম ছড়িয়ে পড়লে দূর-দূরান্ত থেকে অসংখ্য ছাত্র সেখানে হাজির হতে থাকে। সোনারগাঁয়ের তৎকালীন শাসক গিয়াস উদ্দিন আযম শাহ আবূ তাওয়ামা (র) এর সুখ্যাতিতে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে সহযোগিতা করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা ছিল একটি আধুনিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ। শাইখ আবূ তাওয়ামা (র) কুরআন হাদীসে অশেষ জ্ঞান রাখতেন। এছাড়া অন্যান্য বিষয়েও তিনি পারদর্শী ছিলেন। তিনি সোনারগাঁওয়ে গবেষণাগার, খানকা, লঙ্গারখানা, মসজিদ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলেন। এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে লোকদের স্বনির্ভর করে তোলার ব্যবস্থা ছিল। তাঁর শিক্ষায়তনেরই ছাত্র শারফুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া মানেরী তৎকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান তাপস হিসেবে সুখ্যাতি লাভ করেছিলেন। আবূ তাওয়ামা (র) বিভিন্ন শাস্ত্র বিশারদ, প্রজ্ঞাশীল মনীষী ছাড়াও উঁচুস্তরের একজন ওলী ও সাধক ছিলেন। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এদেশে ইসলামী শিক্ষা ও তাহযীব-তামাদ্দুনের ভিত্তিমূল সুদৃঢ় হয়। তিনি ৭০০ হিজরি সনে সোনারগাঁওয়ে ইনতিকাল করেন।

আমরা হযরত আবূ তাওয়ামার জীবন ইতিহাস জানব এবং তাঁর জ্ঞান-সাধনা ও ইসলাম প্রচার থেকে প্রেরণা লাভ করব। জ্ঞান বিতরণ ও ইসলাম প্রচারে নিজেদের নিয়োজিত করব।

মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র)

পরিচয়

মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র) ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশের ইসলাম প্রচারকগণের অন্যতম। তিনি ছিলেন হযরত আবূ বক্‌র সিদ্দিক (রা) এর বংশধর। তিনি ভারতের উত্তর প্রদেশের জৌনপুর শহরে ১২১৫ হিজরি সনে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আবূ ইবরাহীম শাইখ মুহাম্মাদ ইমাম বখশ (র) ছিলেন সে সময়ে ঐ অঞ্চলের ধর্মীয় নেতা।

শিক্ষা

আরবি, উর্দু, ফার্সি প্রভৃতি ভাষায় তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ছিল। তিনি কুরআন, হাদীস, ফিক্‌হসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক শাখায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। অল্প বয়সেই তার চরিত্র মাধুর্য, বাগ্মিতা ও জ্ঞান সাধনার সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

মুসলমানদের নানারূপ কুসংস্কার ও বিজাতীয় আচার-আচরণে লিপ্ত দেখে তিনি কষ্ট অনুভব করতেন এবং এ অভিশাপ থেকে তাদের মুক্ত করার চিন্তা করতেন। তাই ছাত্রজীবন থেকেই তিনি ইল্‌ম শিক্ষার ফাঁকে ফাঁকে মুসলমানদের ঘরে ঘরে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। তাদের রোযা, নামায ইত্যাদি শিক্ষা দিতেন। অমুসলিমদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান বর্জনের আহবান জানাতেন।

শিক্ষা সমাপ্ত করে মাওলানা জৌনপুরী স্বীয় পীর শাহ্ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহ্‌লভী (র) এর নির্দেশে হিদায়াত ও তাবলীগের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি প্রথমে জৌনপুর, গাজীপুর, আযমগড়, ফয়যাবাদ এলাকায় দ্বীনের প্রচার

কাজ চালান। এসকল স্থানে অসংখ্য মাদ্‌রাসা, মসজিদ, মক্তব প্রতিষ্ঠা করে খাঁটি মুসলমান তৈরির ব্যবস্থা করেন। এরপর তিনি আসাম, পূর্ব বাংলা, কলিকাতা, পশ্চিম বাংলাসহ বিস্তৃত অঞ্চলে সুদীর্ঘ ৫১ বছর পর্যন্ত সফর করেন। এ সময় তিনি এসকল জনপদের প্রতিটি অঞ্চলে মুসলমানদের দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হয়ে দীনের প্রচার কার্য পরিচালনা করেন। তাঁর এ দীর্ঘকালব্যাপী সর্বাত্মক প্রচারের ফলে সর্বত্র ইসলামের জাগরণ সৃষ্টি হয়। মুসলমানগণ শির্‌ক, বিদআত ও নানাবিধ কুসংস্কার থেকে মুক্তি পেতে থাকে। আসাম ও বাংলার অনেক অঞ্চলে তখন মুসলমানগণ বিজাতীয় কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও পোশাক পরিচ্ছদে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে মুসলমানদের সকল অপসংস্কৃতি ত্যাগ করে ইসলামী আমল আখলাক গ্রহণ করতে সর্বাত্মক আহবান জানান। তিনি বর্তমানে বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ফরিদপুর, বরিশালসহ বিভিন্ন অঞ্চল সফর করে ইসলামের দাওয়াত দেন। এসব অঞ্চলে অসংখ্য মসজিদ, মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত "মিফতাহুল জান্নাত" গ্রন্থখানি সর্বজন সমাদৃত।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল সফরের এক পর্যায়ে তিনি রংপুর শহরে পৌঁছেন। এখানে তিনি ১২৯০ হিজরি সনের ৩রা রবিউস সানি শুক্রবার ইনতিকাল করেন।

আমরা তাঁর আদর্শ অনুসরণ করব। ইসলামী তাহ্‌যীব-তামাদ্দুন মেনে চলব। অপসংস্কৃতি ও কুসংস্কার থেকে দূরে থাকব।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কার পায়ের কাছ থেকে জমজম কূপের সৃষ্টি হয় ?

ক. হযরত ইসমাঈল (আ) খ. হযরত ইবরাহীম (আ)
গ. হযরত নূহ (আ) ঘ. হযরত শীষ (আ)

২। হযরত ইবরাহীম (আ) এর শিশুপুত্র ইসমাঈলের কুরবানী মানব চরিত্রের কোন দিক ফুটে উঠেছে?

ক. ত্যাগ খ. ধৈর্য
গ. সততা ঘ. সহমর্মিতা

৩। হযরত ইউসুফ (আ) ছিলেন–

ক. বাণিজ্য মন্ত্রী খ. খাদ্য মন্ত্রী
গ. অর্থ মন্ত্রী ঘ. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী

৪। ইসলাম প্রচারকালে রাসূল (স) কে গালি দিত ও পাগল, যাদুকর ইত্যাদি আখ্যা দিত–

ক. মক্কার কুরাইশরা খ. মক্কার কাফিররা
গ. ইসলাম বিরোধীরা ঘ. ইয়াহুদীরা

নিচের অনুচ্ছেদের আলোকে ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রিফাত শারীরিক অসুস্থতায় অধৈর্য হয়ে পড়ল। তার বন্ধু ওলী তাকে সান্তনা দিয়ে বলল– হযরত আয়্যুব (আ) এর শরীরে ক্ষতরোগের কারণে মাংস পচে পোকা ধরেছিল। অথচ তিনি আল্লাহ্‌র যিক্‌র থেকে বিরত থাকেননি।

৫। অসুস্থাবস্থায় রিফাতের কি করা উচিত–

i. ধৈর্য ধারণ করা

ii. ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া

iii. নিজের বুদ্ধিমত ঔষধ সেবন

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. i ও ii

৬। হযরত আয়্যুব (আ) অসুস্থ অবস্থায়ও আল্লাহ্‌র যিক্‌রে মশগুল ছিলেন–

i. আল্লাহ্‌র নবী ছিলেন বলে

ii. আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য

iii. এলাকার লোকদের ভয়ে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। জিলহাজ্জ মাসের চাঁদ উঠেছে। তাহমিনা বলল, আব্বু-কুরবানীর ঈদ কখন হবে ? বাবা বললেন–আর দশ দিন পর, জিলহাজ্জ মাসের দশ তারিখ। তাহমিনা বলল– কোন সময় থেকে পশু কুরবানী করা শুরু হয়েছে ? বাবা বললেন– হযরত ইবরাহীম (আ) শিশুপুত্র ইসমাঈল (আ) কে কুরবানী দিতে গিয়ে আল্লাহ্‌র মহিমায় অলৌকিকভাবে একটি দুম্বা কুরবানী হয়ে যায়। তখন থেকে পশু কুরবানী শুরু।

ক. হযরত ইসমাঈল (আ) কে ছিলেন ?

খ. হযরত ইবরাহীম (আ) কেন পুত্র ইসমাঈলকে কুরবীন দেন।

গ. হযরত ইসমাঈল (আ) এর কুরবানী সম্পর্কিত ঘটনা থেকে আমরা কী শিক্ষা নিতে পারি–ব্যাখ্যা কর।

ঘ. পিতার প্রস্তাবে ইসমাঈল (আ) এর ধৈর্যের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা বুঝিয়ে লিখ।

২। মুনতাসির শুনেছে দেশে দেশে মুসলিমরা ইসলামবিরোধী শক্তির হাতে মার খাচ্ছে। ইসলামের প্রথম যুগের মুসলমানরাও ইসলাম গ্রহণের কারণে প্রচণ্ড বিরোধিতা ও নির্যাতনের শিকার হন। হযরত বিলাল (রা) কে মক্কার কুরাইশরা প্রচণ্ড নির্যাতন করেছিল। শত নির্যাতনের মুখেও তিনি ইসলাম ত্যাগ করেননি বরং বলেছিলেন 'আহাদ', 'আহাদ'।

ক. আহাদ শব্দের অর্থ কী ?

খ. হযরত বিলাল (রা) এর উপর নির্যাতনের কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. ইসলামের পথে মুনতাসির নির্যাতিত হলে তার কী করা উচিত হবে ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ইসলাম কীরূপ ত্যাগ ও ধৈর্যের শিক্ষা দেয়–হযরত বিলাল (রা) এর ঘটনার আলোকে বর্ণনা কর।

৩। জনাব শাব্বির আহমেদ তার অসুস্থ বাবাকে গ্রাম থেকে শহরে নিয়ে এসে চিকিৎসা করাতে থাকেন। বহুমুত্র রোগ ধরা পড়ার পর তাঁর কিডনীতে সমস্যা দেখা দেয়। দীর্ঘদিন হাসপাতালে থাকার পরও কোন উন্নতি হয়নি। এক বছর পর চোখের সমস্যা দেখা দেয়। তিনি তার বাবাকে দুই বছর যাবৎ নিজের বাড়িতে রেখে চিকিৎসা করাচ্ছেন। শাব্বির আহমেদ সাহেবের দুই ভাই হাসপাতালে থাকাকালীন অবস্থায় বাবাকে দেখতে আসত। এখন তারা আর কোন খোঁজ-খবর রাখে না। তিনি তার মেয়ে নুরজাহানের সাথে হযরত আয়্যুব (আ) এর অসুস্থতা এবং তাঁর স্ত্রীর সেবা নিয়ে আলোচনাকালে নুরজাহান বলল, বাবা আমরা সকলে হযরত আয়্যুব (আ) এর স্ত্রীর সেবা ও ধৈর্য থেকে শিক্ষা নিতে পারি।

ক. হযরত আয়্যুব (আ) এর স্ত্রীর নাম কী ছিল ?

খ. হযরত আয়্যুব (আ) এর অসুস্থতার বিষয়টি ব্যাখ্যা কর।

গ. হযরত আয়্যুব (আ) এর স্ত্রীর সেবা থেকে নুরজাহান কী শিক্ষা নিতে পারে ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. “রোগীকে সেবা করা একটি মহৎ কাজ”– বুঝিয়ে লেখ।

পর্যবেক্ষণ ও সামগ্রিক মূল্যায়ন

১. ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গির পর্যালোচনা করা।

২. ইসলামের বিষয়বস্তু অনুধাবনের পরিধি যাচাই করা।

৩. শ্রেণীকক্ষে পাঠদানকালে শিক্ষার্থীদের আলোচনায় অংশগ্রহণ ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পঠিত বিষয়ের মৌলিক দিকগুলো আয়ত্তকরণ ও পর্যালোচনা করা।

৪. সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্যবিষয়ের ওপর সম্ভব হলে সাপ্তাহিক, মাসিক ও বাৎসরিক আলোচনা সভায় শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে তাদের জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা যাচাই করা।

৫. ইবাদাত করার প্রবণতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে কি না তা যাচাই করা।

৬. নিজ ও অন্যান্য বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইসলাম শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা ও প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতার ফলাফল ও রেকর্ড মূল্যায়ন করা।

৭। মসজিদ, নামায ঘর, মক্তব, লাইব্রেরী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ ও দায়িত্ব পালনের রেকর্ড মূল্যায়ন করা।

৮. কুরআন মাজীদ, হাদীস শরীফ ও ইসলামী সাহিত্য এবং পত্রপত্রিকা পাঠ সম্বন্ধে ধারণা ও অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন করা।

৯. ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনে ইসলামী বিধানের প্রয়োগ ও গুরুত্ব সম্পর্কে অর্জিত ধারণা ও অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন করা।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন ছক

পোশাক-পরিচ্ছদ	আচার-আচরণ	শ্রেণীকক্ষে উপস্থিতি	ধর্মীয়/সামাজিক কর্মকাণ্ড	অভিভাবক/শিক্ষকের অভিমত	সামগ্রিক মূল্যায়ন

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. নৈতিক চরিত্র গঠনে কুরআনের শিক্ষা– ডঃ আহমেদ শামসুল ইসলাম
২. ইহ্ইয়াউ উলূম-আদ-দ্বীন– ইমাম গায্যালী (র)
৩. শর্‌হে বিকায়া– মাওলানা নূরুদ্দীন আহমাদ কর্তৃক অনূদিত
৪. আল–কুরআনুল কারীম– ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ
৫. তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন– মুফ্‌তী মুহাম্মদ শফী (র)
৬. হাদীস সংকলনের ইতিহাস– মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম
৭. সাইয়্যেদুল মুরসালীন– আবদুল খালেক (ই. ফা)
৮. বিশ্বনবী– গোলাম মোস্তফা
৯. মানুষের নবী– মুহাম্মদ আব্দুল জব্বার সিদ্দিকী
১০. মরু ভাস্কর– কাজী নজরুল ইসলাম
১১. সাহাবা চরিত– আখতার ফারুক
১২. নবীগৃহ সংবাদ– মুহাম্মদ বরকত উল্লাহ
১৩. গুনিয়াতুত্‌ তালেবীন– বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (র)
১৪. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ– ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ
১৫. হযরত ফাতিমা (রা)– মনিরুদ্দীন ইউসুফ

সমাপ্ত